গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা

জেলা তথ্য ঃ নড়াইল

আবু মোস্তফা কামাল উদ্দিন
এবং
মোঃ সাইদ ইফতেখার

জানুয়ারি, ২০০৫

প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট অফিস
সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রকল্প

জেলা তথ্য :
নড়াইল

প্রকাশকাল :
জানুয়ারি, ২০০৫

প্রকাশনায় :
পিডিও-আইসিজেডএমপি
সায়মন সেন্টার (৫ম ও ৬ষ্ঠ তলা)
বাড়ি : ৪এ, রোড : ২২
গুলশান ১, ঢাকা ১২১২
ফোন : (৮৮০-২) ৮৮২৬৬১৪, ৯৮৯২৭৮৭
ফ্যাক্স : (৮৮০-২) ৮৮২৬৬১৪
ই-মেইল : pdo@iczmpbd.org
ওয়েব সাইট : www.iczmpbangladesh.org
ও
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো)
বাড়ি : ১০৩, রোড : ০১
বনানী, ঢাকা ১২১৩।

প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট অফিস - সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (পিডিও-আইসিজেডএমপি) বাংলাদেশ, নেদারল্যান্ড ও যুক্তরাজ্য সরকারের অর্থায়নে পরিচালিত একটি বহুখাতভিত্তিক এবং বহুপ্রতিষ্ঠানভিত্তিক উদ্যোগ, যেখানে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হচ্ছে মূল মন্ত্রণালয় এবং পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) মূল সংস্থা।

মুদ্রন সহযোগিতায় :

ISBN :

তথ্যের প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে জনগণের ক্ষমতায়নের একটি প্রয়াস
জেলা তথ্য : নড়াইল

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি অন্য অঞ্চল থেকে স্বতন্ত্র। একদিকে প্রকৃতির অপার সম্পদ অন্যদিকে প্রকৃতির বিরূপতার প্রতি লক্ষ্য রেখেই এ অঞ্চলের ১৯টি জেলার উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। এ লক্ষ্যে পিডিও-আইসিজেডএম প্রকল্প একটি নীতিমালা প্রণয়ন ও কর্মকৌশল নির্ধারণ করেছে। কর্মকৌশলগুলোর ভিত্তিতে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে। উন্নয়ন কার্যক্রমে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ কার্যকরি করতে উপকূলীয় অঞ্চলের ১৯টি জেলার প্রতিটির জন্য একটি করে তথ্য বই লেখা হচ্ছে যাতে করে জেলার জনগণ স্ব-স্ব জেলার উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখতে পারবে।

আবু মোস্তফা কামাল উদ্দিন এবং মোঃ সাইদ ইফতেখার যৌথভাবে এই বইটি লিখেছেন। অন্যান্য যারা এই বই লিখতে বিভিন্ন সময়ে সহযোগিতা করেছেন তারা হলেন মহিউদ্দিন আহমদ ও ড. মোঃ লিয়াকত আলী। অক্ষর বিন্যাস ও লে- আউটে সহযোগিতা করেছেন মোঃ নুরুজ্জামান মিয়া।

বইটির পর্যালোচনাসহ মতামত দিয়েছেন পিডিও ও ওয়ারপো-র বিশেষজ্ঞ বৃন্দ। এ ছাড়া নড়াইল জেলার বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ মতামত দিয়ে বইটিকে সমৃদ্ধ করেছেন।

ড. এম. রফিকুল ইসলাম বইটি লিখতে সার্বিক পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা দিয়েছেন।

মুখবন্ধ

বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জেলাভিত্তিক। ঐতিহ্যগতভাবেই মানুষের জেলাভিত্তিক পরিচয় রয়েছে। অপরদিকে জেলাগুলোরও সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য রয়েছে। স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রও জেলা। অন্যদিকে উপকূলীয় জীবনমানের উন্নয়নের জন্য জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করার নীতিগত সিদ্ধান্ত উপকূলীয় অঞ্চলের নীতিমালায় রয়েছে।

সমন্বিত উপকূল অঞ্চল ব্যবস্থাপনার মূল নীতি হল জনগণের অংশগ্রহণে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। উপকূলীয় অঞ্চল উন্নয়নে জেলাভিত্তিক উদ্যোগকে কার্যকর করতে প্রয়োজন জেলার জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ। তাই, জেলার জনগণকে তাদের নিজ নিজ জেলার অবস্থা, অবস্থান, প্রাকৃতিক সম্পদ, সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে অবহিত করার জন্য জেলাভিত্তিক এই বই লেখা হয়েছে। উপকূলীয় ১৯টি জেলার জন্য আলাদা আলাদা বই লেখা ও প্রচার করা হচ্ছে।

এই বইটি লেখা হয়েছে নড়াইল জেলার জনগণকে উন্নয়ন কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট করার জন্য। এতে রয়েছে জেলার প্রাকৃতিক সম্পদ, কৃষি সম্পদ, বনজ ও ফলজ সম্পদ এবং মানব সম্পদের বর্ণনা এবং ভবিষ্যতে এ সম্পদের অবস্থা কি হতে পারে সেই বর্ণনা।

এই বই-এর প্রধান অংশগুলো হচ্ছে 'সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা' এবং 'সম্ভাবনা ও সুযোগ'-এর উপর বিশদ বর্ণনা। এই বর্ণনার তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণ উপস্থাপিত হয়েছে অন্যান্য অংশে। তাই জেলার সমস্যা ও সম্ভাবনাগুলো জেনে নিয়ে উন্নয়ন পরিকল্পনায় আগ্রহ সৃষ্টি ও অবদান রাখতে এই বই জনগণ তথা উন্নয়ন অংশীদারদের সাহায্য করবে।

তা ছাড়াও 'উপকূলীয় উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণ' আলোচনা এবং অন্যান্য উন্নয়ন সহায়ক আলোচনায় এই বই সহায়তা করবে বলে আমরা আশা করি।

এই বইয়ের জন্য তথ্য নেয়া হয়েছে প্রধানত বি.বি.এস. এর বিভিন্ন প্রকাশনা থেকে। এর পরেই সবচেয়ে বেশি তথ্য এসেছে প্রকল্পের বিভিন্ন প্রকাশনা থেকে। এ ছাড়াও পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাপিডিয়া, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ আবহাওয়া পরিদপ্তর থেকে তথ্য নেয়া হয়েছে।

সাহায্য নেয়া হয়েছে নড়াইলের উপরে লিখিত বিভিন্ন বই থেকে -

১. সতীশচন্দ্র মিত্র, ১৯১৪। যশোহর খুলনার ইতিহাস-প্রথম খণ্ড। দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩। কলকাতা, ১৯১৪।

২. সতীশচন্দ্র মিত্র, ১৯২২। যশোহর খুলনার ইতিহাস-দ্বিতীয় খণ্ড। দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩। কলকাতা, ১৯২২।

৩. বি.বি.এস., ২০০৩। কৃষি শুমারী ১৯৯৬ : জেলা সিরিজ নড়াইল। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। ঢাকা, এপ্রিল ২০০৩।

৪. বি.বি.এস., ১৯৯৬। আদম শুমারী ১৯৯১ : জেলা সিরিজ নড়াইল। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬।

৫. ওয়াজেদ, আবদুল, ২০০২। বাংলাদেশের নদীমালা। পালক পাবলিশার্স। ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০০২।

৬. CEGIS, 2004. Vulnerability Analysis of Major Livelihood Groups in the Coastal Zone of Bangladesh, Final Report. Centre for Environmental and Geographic Information Services. Dhaka, May 2004.

৭. Latiful Bari, K.G.M., 1979. Bangladesh District Gajetteers Jessore. Establishment, Division, Government of the People's Republic of Bangladesh. Dhaka, February 1979.

৮. WARPO. 2004. District Level Integrated Water Resources Management Plans, Annex D- Narail District. Asian Development Bank, Bangladesh Water Development Board and Water Resources Planning Organization. Dhaka, March 2004.

তথ্য নেয়া হয়েছে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে নড়াইল জেলার উপর প্রকাশিত সংবাদ ও নিবন্ধ থেকে।

এ ছাড়াও বইটির বিশেষ পর্যালোচনা ও মূল্যবান তথ্য ও মতামত দিয়েছেন :

- জনাব শ্যামুয়েল এস. বোস, নিউ লাইফ ফাউন্ডেশন, নড়াইল।
- জনাবা মাজেদা খানম, জাতীয় মহিলা সংস্থা, নড়াইল।
- জনাবা রোজালীন নন্দিতা গোস্মামী, বাংলাদেশ মহিলা উন্নয়ন সংস্থা, নড়াইল।
- জনাবা রত্না রানী দাস, গার্লস অরফানেস হোম, নড়াইল।
- জনাবা এনজেলা নিনা বোস, বি.সি.ডাব্লিউ., নড়াইল।

সূচীপত্র

মুখবন্ধ
জেলা মানচিত্র

সূচনা **১**
এক নজরে নড়াইল ২
জেলার অবস্থান ৩
উপজেলা তথ্য সারনী ৪

প্রকৃতি ও পরিবেশ **৫**
প্রাকৃতিক পরিবেশ ৫
কৃষি সম্পদ ৮
দুর্যোগ ৮
বিপদাপন্নতা ১০

জীবন ও জীবিকা **১১**
জনসংখ্যা ১১
জনস্বাস্থ্য ১১
শিক্ষা ১২
অভিবাসন ১২
সামাজিক উন্নয়ন ১২
অর্থনৈতিক অবস্থা ১২
প্রধান জীবিকা দল ১৩
দারিদ্র্য ১৩

নারীদের অবস্থান **১৫**

অবকাঠামো **১৭**
রাস্তা-ঘাট ১৭
সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ১৭
অর্থনৈতিক অবকাঠামো ১৭
শিল্প ও বাণিজ্য অবকাঠামো ১৮
কৃষি অবকাঠামো ১৮
উন্নয়ন প্রকল্প ১৮

সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা **২১**
পরিবেশগত সমস্যা ২১
আর্থ-সামাজিক সমস্যা ২৩

সম্ভাবনা ও সুযোগ **২৫**
কৃষি সম্পদ উন্নয়ন ২৫
শিল্প উন্নয়ন ২৬
আর্থ-সামাজিক এবং অবকাঠামোগত উন্নয়ন ২৭

ভবিষ্যতের রূপরেখা **২৯**

দর্শনীয় স্থান **৩১**

জেলা মানচিত্র

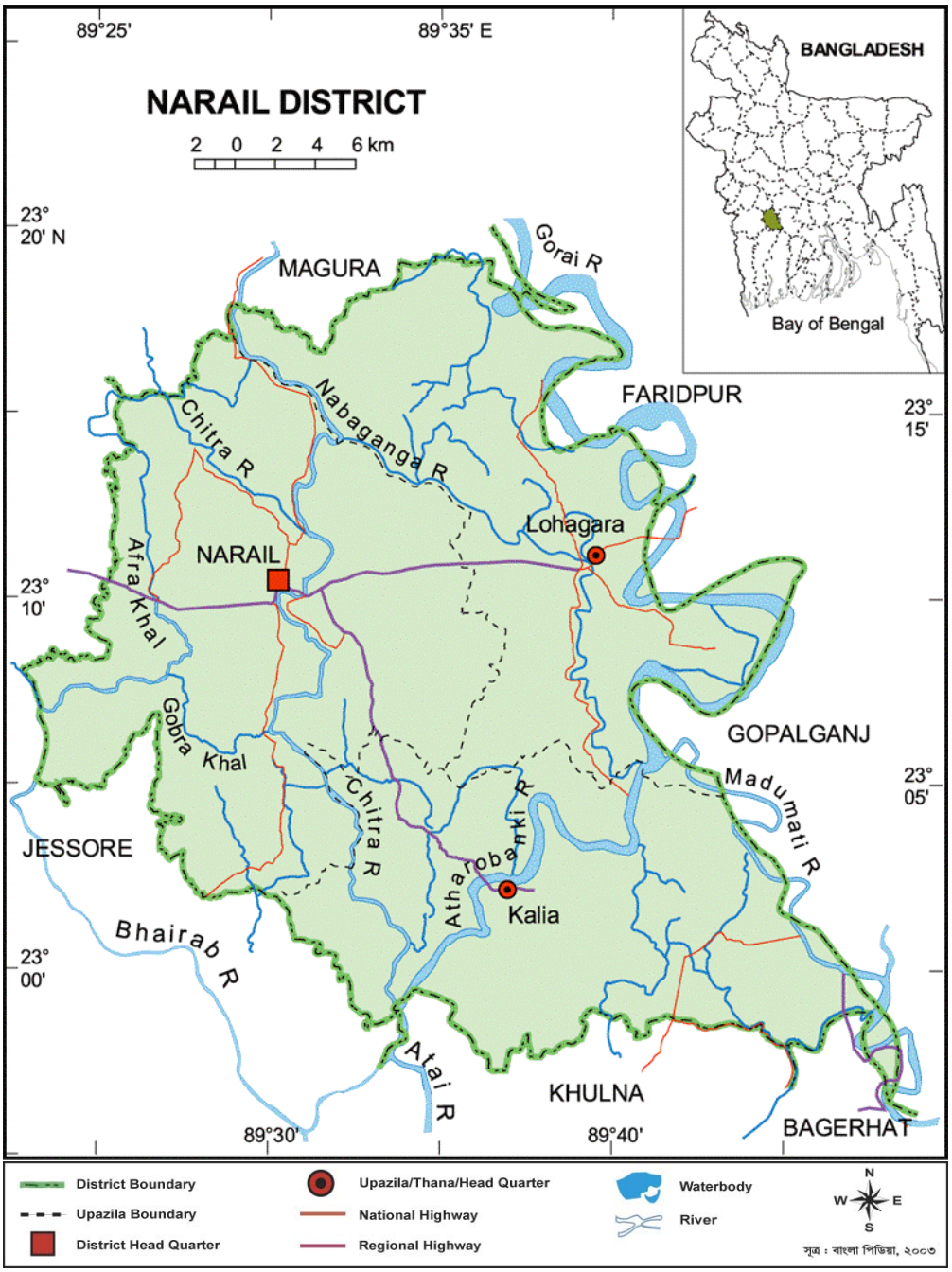

89°25'
89°35' E
NARAIL DISTRICT
2 0 2 4 6 km
23° 20' N
23° 15'
23° 10'
23° 05'
23° 00'
BANGLADESH
Bay of Bengal
MAGURA
FARIDPUR
GOPALGANJ
JESSORE
KHULNA
BAGERHAT
Gorai R
Nabaganga R
Chitra R
Afra Khal
Gobra Khal
Bhairab R
Atai R
Atharobanki R
Madumati R
NARAIL
Lohagara
Kalia
89°30'
89°40'
District Boundary
Upazila Boundary
District Head Quarter
Upazila/Thana/Head Quarter
National Highway
Regional Highway
Waterbody
River
N
W
E
S
সূত্র : বাংলা পিডিয়া, ২০০৩

সূচনা

ঐতিহ্যবাহী জেলা নড়াইল। শিল্প ও বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে প্রাচীনকাল থেকেই সুপরিচিত। খুলনা বিভাগে অবস্থিত এই জেলার উত্তরে মাগুরা, পূর্বে গোপালগঞ্জ ও ফরিদপুর, দক্ষিণে খুলনা ও পশ্চিমে যশোর জেলা অবস্থিত।

ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, প্রাচীন যশোর নদী-নালা পূর্ণ ছিল এবং এখানে বিক্ষিপ্তভাবে জেলে ও মাঝিদের বসতি ছিল। টলেমির ম্যাপ থেকে দেখা যায় যে, এই অঞ্চল গঙ্গার দুটি প্রধান শাখা ভগিরথী ও পদ্মা অববাহিকায় গঠিত ব-দ্বীপের দক্ষিণাংশ ছিল। মহাভারত ও পুরানেও এই এলাকার উল্লেখ পাওয়া যায়। এক সময় এই এলাকা বঙ্গ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

নড়াইলের ইতিহাস শুরু জমিদার কালীশঙ্কর চৌধুরীর আমল থেকে। কালীশঙ্করের বাবা ছিলেন নাটোর রাজ সরকারের উকিল। রানী ভবানীর অনুগ্রহে তিনি নড়াইলের আদালতপুর তালুক ক্রয় করেন। তাছাড়া চিত্রা নদীর তীরে একটি বাজারও প্রতিষ্ঠা করেন, যা রূপগঞ্জ নাম নিয়ে আজও অন্যতম ব্যবসা কেন্দ্র হিসেবে স্বীকৃত। এখানে সাপ্তাহিক হাট বসে। নড়াইল জেলা বৃহত্তর যশোর জেলার একটি থানা ছিল। মহকুমা হিসেবে নড়াইল স্বীকৃতি পায় ১৮৬১ সালে। এ সময় নানা রকম সরকারি অফিস ও আদালত গড়ে ওঠে। টাউন হল নির্মিত হয় ১৯১৪ সালে। নড়াইল রাইফেল ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪৮ সালে। ১৯৬০ সাল থেকে এ ক্লাবের নাম হয় নড়াইল ক্লাব। ১৯৮৪ সালে নড়াইল জেলা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই জেলার মোট আয়তন ৯৯০ বর্গ কি. মি., যা সমগ্র বাংলাদেশের আয়তনের ০.৬৭%। জেলার মোট লোকসংখ্যা ৬.৯৪ লাখ। আয়তনের দিক দিয়ে উপকূলীয় জেলাগুলোর মধ্যে এ জেলার অবস্থান ১৭তম এবং জনসংখ্যার দিক দিয়ে উপকূলীয় জেলাগুলোর মধ্যে ১৮তম।

উপজেলা	৩
পৌরসভা	২
ইউনিয়ন/ওয়ার্ড	৫৫
মৌজা/মহল্লা	৪৬৬
গ্রাম	৬৪৯

৩টি উপজেলা, ২টি পৌরসভা, ৫৫টি ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড, ৪৬৬টি মৌজা/মহল্লা ও ৬৪৯টি গ্রাম নিয়ে নড়াইল জেলা। নড়াইল সদর, কালিয়া ও লোহাগড়া জেলার তিনটি উপজেলা। উপজেলাগুলোর মধ্যে নড়াইল সদরের আয়তন সবচেয়ে বড়। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে উপকূলীয় অঞ্চলের ভূমিভিত্তিক সীমা নির্ধারণের জন্য তিনটি সূচক বিবেচনা করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে : জোয়ার-ভাটার প্রভাব, নোনা পানির অনুপ্রবেশ এবং ঘূর্ণিঝড় / জলোচ্ছ্বাস। এর ভিত্তিতে জেলার তিনটি উপজেলাই অন্তর্বর্তী (Interior Coast) উপকূলীয় এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে ।

এক নজরে নড়াইল

	বিষয়	একক	নড়াইল	উপকূলীয় অঞ্চল	বাংলাদেশ	তথ্য সূত্র ও বছর
এলাকা/ প্রশাসনিক	এলাকা	বর্গ কি.মি.	৯৯০	৪৭,২০১	১,৪৭,৫৭০	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	উপজেলা	সংখ্যা	৩	১৪৭	৫০৭	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	ইউনিয়ন	সংখ্যা	৩৭	১,৩৫১	৪,৪৮৪	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	পৌরসভা	সংখ্যা	২	৭০	২২৩	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	ওয়ার্ড	সংখ্যা	১৮	৭৪৩	২,৪০৪	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	মৌজা / মহল্লা	সংখ্যা	৪৬৬	১৪,৬৩৬	৬৭,০৯৫	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	গ্রাম	সংখ্যা	৬৪৯	১৭,৬১৮	৮৭,৯২৮	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
জনসংখ্যা	মোট জনসংখ্যা	লাখ	৬.৯৪	৩৫০.৭৮	১২৩৮.৫১	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	পুরুষ	লাখ	৩.৫০	১৭৯.৪২	৬৩৮.৯৫	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	নারী	লাখ	৩.৪৪	১৭১.৩৫	৫৯৯.৫৬	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	জনসংখ্যার ঘনত্ব	বর্গ কি.মি.	৭০২	৭৪৩	৮৩৯	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	লিঙ্গ অনুপাত	অনুপাত	১০২	১০৫	১০৭	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	গৃহস্থালির আকার	গৃহ প্রতি জনসংখ্যা	৫	৫.১	৪.৯	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	গৃহস্থালির মোট সংখ্যা	লাখ	১.৪০	৬৮.৪৯	২৫৩.০৭	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	নারী প্রধান গৃহ	গ্রামীণ গৃহস্থের (%)	৪	৩.৪৪	৩.৫	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
ভৌত অবকাঠামো	টেকসই দেয়ালসম্পন্ন ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	২৪	৪৭	৪২	১৯৯১(বি.বি.এস.,১৯৯৪)
	টেকসই ছাদসম্পন্ন ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	৪৮	৫০	৫৪	১৯৯১(বি.বি.এস.,১৯৯৪)
	বিদ্যুৎ সংযোগসম্পন্ন ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	২০	৩১	৩১	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	প্রাথমিক স্কুল	সংখ্যা / ১০,০০০ জন	৮	৭	৬	২০০১(প্রা.শি.অ, ২০০৩)
	রাস্তার ঘনত্ব	কি.মি./বর্গ কি.মি.	০.৪৪	০.৭৬	০.৭২	বিশ্ব ব্যাংক, ১৯৯৬ ও ব.বি.এস.,২০০৩
	বাজারের ঘনত্ব	বর্গ কি.মি. / সংখ্যা	৬৬	৮০	৭০	১৯৯৬ (বিশ্ব ব্যাংক, ১৯৯৬)
অর্থনীতি	মোট আয়	কোটি টাকা	১,২২৬	৬৭,৮৮০	২,৩৭,০৭৪	১৯৯৯/২০০০(বি.বি.এস.,২০০২)
	মাথাপিছু আয়	টাকা	১৬,২৪৯	১৮,১৯৮	১৮,২৬৯	১৯৯৯/২০০০(বি.বি.এস.,২০০২)
	কর্মক্ষম শ্রম শক্তি (১৫ বছর+)	হাজার	২০৯	১৭,৪১৮	৫৩,৫১৪	১৯৯৯/২০০০(বি.বি.এস.,২০০২)
	কর্মরত নারী (খাদ্য বা অর্থের বিনিময়ে)	% (১৫-৪৯ বয়সদল)	২৫	২৬	২৮	২০০১ (নির্পেটি, ২০০৩)
	কৃষি শ্রমিক	গ্রামীণ গৃহস্থের (%)	৩১	৩৩	৩৬	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
	জেলে	গ্রামীণ গৃহস্থের (%)	৪	১৪	৮	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
	মাথাপিছু কৃষি জমির পরিমাণ	হেক্টর	০.০৯	০.০৬	০.০৭	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
	দারিদ্র	মোট গৃহস্থের (%)	৪১	৫২	৪৯	১৯৯৮(বি.বি.এস.,২০০২)
	অতি দারিদ্র	মোট গৃহস্থের (%)	১৪	২৪	২৩	১৯৯৮(বি.বি.এস.,২০০২)
শিক্ষা	প্রাথমিক স্কুলে ভর্তির হার	৬-১০ বছর শিশু(%)	১৩৪	৯৫	৯৭	২০০১(প্রা.শি.অ, ২০০৩)
	সাক্ষরতার হার, ৭ বছর+	মোট জনসংখ্যা (%)	৪৮	৫১	৪৫	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	পুরুষ	%	৫১	৫৪	৫০	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	নারী	%	৪৪	৪৭	৪১	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	সাক্ষরতার হার, ১৫ বছর+	মোট জনসংখ্যা (%)	৫২	৫৭	৪৭	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	পুরুষ	%	৫৭	৬১	৫৪	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	নারী	%	৪৬	৪৯	৪১	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
স্বাস্থ্য	গ্রামীণ পানি সরবরাহ (সক্রিয় টিউবওয়েল)	প্রতি গড় জনসংখ্যা	৯৩	১১১	১১৫	২০০২ (ডি.পি.এইচ.ই., ২০০৩)
	কল অথবা নলকূপের পানির সুবিধাপ্রাপ্ত ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	৯৬	৮৮	৯১	২০০১(বি.বি.এস., ২০০৩)
	স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার সুবিধাপ্রাপ্ত ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	৪১	৪৬	৩৭	২০০১(বি.বি.এস., ২০০৩)
	হাসপাতালের শয্যাপ্রতি জনসংখ্যা (সরকারি)	জন / শয্যা	৬,৩২২	৪,৬৩৭	৪,২৭৬	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	নবজাতক মৃত্যুর হার	প্রতি হাজারে	৫২	৫১-৬৮	৫৬	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	<৫ বছর শিশু মৃত্যুর হার	প্রতি হাজারে	৯৪	৮০-১০৩	৯০	২০০০ (বি.বি.এস. ও ইউনিসেফ, ২০০১)
	অতি অপুষ্টির হার	%	৭	৬	৬	২০০০ (বি.বি.এস. ও ইউনিসেফ, ২০০১)
	ছেলে	%	৫	৪	৪	২০০০ (বি.বি.এস. ও ইউনিসেফ, ২০০১)
	মেয়ে	%	৯	৮	৬	২০০০ (বি.বি.এস. ও ইউনিসেফ, ২০০১)
	মাতৃ মৃত্যুর হার	প্রতি হাজারে	৫	৫	৫	১৯৯৮/৯৯ (স্বাস্থসেবা অধিদপ্তর, ২০০০)
	আধুনিক জন্মনিয়ন্ত্রন পদ্ধতি গ্রহণকারী নারী	%	৪১	৪১	৪৪	২০০১ (নির্পেটি, ২০০৩)

জেলার অবস্থান

জাতীয় অবস্থার তুলনায় ভাল দিক

- স্বাক্ষরতার হার (৭^{+} বছর) ৪৮% যা জাতীয় হারের (৪৫%) তুলনায় বেশি।
- জেলার নবজাতক মৃত্যুর হার (প্রতি হাজারে ৫১) যা জাতীয় (প্রতি হাজারে ৫৬) হারের তুলনায় অনেক কম।
- জেলার দরিদ্র ও অতি দরিদ্র গৃহস্থালির সংখ্যা (৪১%, ১৪%), জাতীয় (৪৯%, ২৩%) ও সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলের (৫২%, ২৪%) তুলনায় অনেক কম।
- জেলার মোট গৃহের ৯৭% কল বা নলকূপের পানির সুবিধাপ্রাপ্ত, যা জাতীয় (৯১%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৮৮%) হারের তুলনায় অনেক বেশি।
- জেলার গড়ে প্রতি ৬৬ বর্গ কি. মি. এলাকায় একটি হাট-বাজার কেন্দ্র রয়েছে, যা জাতীয় (৭০ বর্গ কি. মি. এ একটি) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৮০ বর্গ কি. মি. এ একটি) তুলনায় সুবিধাজনক।
- ক্ষুদ্র কৃষকদের সংখ্যা (৫১%) জাতীয় (৫৩%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৫৮%) তুলনায় কম।
- জেলার ভূমিহীনদের সংখ্যা (৪১%), যা জাতীয় (৫৪%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৫৩%) তুলনায় কম।
- জেলার ৪১% গৃহে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার সুবিধা রয়েছে, যা জাতীয় হারের (৩৭%) তুলনায় অনেক বেশি, কিন্তু উপকূলীয় অঞ্চলের হারের (৪৬%) তুলনায় কম।
- মাতৃমৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৫ জন, যা জাতীয় (৫ জন) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৫ জন) সমান।
- নিম্ন মাত্রার লিঙ্গীয় অসমতা।

জাতীয় অবস্থার তুলনায় দুর্বল দিক

- নড়াইল জেলার মাথাপিছু আয় (১৬,২৪৯ টাকা) জাতীয় (১৮,২৬৯ টাকা) ও উপকূলীয় অঞ্চলের গড় আয়ের (১৮,১৯৮ টাকা) তুলনায় কম।
- জেলার বার্ষিক আয় প্রবৃদ্ধির হার (৪.৬%) জাতীয় ও উপকূলীয় অঞ্চলের হারের (৫.৪%) চেয়ে অনেক কম।
- রাস্তার ঘনত্ব (০.৪৪ কি. মি./ বর্গ কি. মি.), জাতীয় (০.৭২ কি. মি./বর্গ কি. মি.) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (০.৭৬ কি. মি./ বর্গ কি. মি.) চেয়ে কম।
- জেলার মোট আয়ে শিল্পখাতের অবদান ১৩%, যা জাতীয় (২৫%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (২২%) হারের তুলনায় কম।
- জেলায় ২০% গৃহে বিদ্যুৎ সংযোগ রয়েছে, যা জাতীয় (৩১%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৩১%) তুলনায় কম।
- জেলার ৪১% গৃহে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার সুবিধা রয়েছে যা কিন্তু উপকূলীয় অঞ্চলের হারের (৪৬%) তুলনায় কম।
- হাসপাতালে শয্যা প্রতি জনসংখ্যা ৬,৩২২ জন, যা জাতীয় (৪,২৭৬) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৪,৬৩৭) তুলনায় অনেক বেশি।
- জেলায় ১৩-৪৯ বয়স দলের নারীদের মধ্যে আধুনিক জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারের হার ৪১%, যা জাতীয় (৪৪%) হারের তুলনায় কম ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৪১%) সমান।
- জেলায় শহুরে জনসংখ্যার ভাগ (১০%) জাতীয় ও উপকূলীয় অঞ্চলের (২৩%) তুলনায় অনেক কম।

উপজেলা তথ্য সারণী

বিষয়		একক	নড়াইল	উপজেলা			তথ্য সূত্র ও বছর
				সদর	কালিয়া	লোহাগড়া	
এলাকা/ প্রশাসনিক	এলাকা	বর্গ কি.মি.	৯৯০	৩৮২	৩১৮	২৯১	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	ইউনিয়ন / ওয়ার্ড	সংখ্যা	৫৫	২২	২১	১২	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	মৌজা / মহল্লা	সংখ্যা	৪৬৬	১৯০	১২৭	১৪৯	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	গ্রাম	সংখ্যা	৬৪৯	২৩০	১৮৭	২৩২	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
জনসংখ্যা	মোট জনসংখ্যা	লাখ	৬.৯৪	২.৭১	২.০৬	২.১৮	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	পুরুষ	লাখ	৩.৫০	১.৩৮	১.০৩	১.১০	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	নারী	লাখ	৩.৪৪	১.৩৩	১.০৩	১.০৮	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	জনসংখ্যার ঘনত্ব	জন/বর্গ কি.মি.	৭০২	৭০৯	৬৪৭	৭৫১	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	নারী পুরুষের অনুপাত	অনুপাত	১০২	১০৪	৯৯	১০২	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	গৃহস্থালির মোট সংখ্যা	লাখ	১.৪০	০.৫৪	০.৪২	০.৪৪	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	গৃহস্থালির আকার	জন/গৃহস্থালি	৫	৫	৪.৯৫	৪.৯৩	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	নারী প্রধান গৃহ	মোট গ্রামীণ গৃহস্থের %	৪	১.৫	১.৯	১.৮	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
ভৌত অবকাঠামো	টেকসই দেয়ালসম্পন্ন ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	২৪	২৯	৩১	২৪	১৯৯১(বি.বি.এস.,১৯৯৪)
	টেকসই ছাদসম্পন্ন ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	৪৮	৪১	৫৩	৫১	১৯৯১(বি.বি.এস.,১৯৯৪)
	বিদ্যুৎ সংযোগসম্পন্ন ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	৩	৪	১	২	১৯৯১(বি.বি.এস.,১৯৯৪)
	প্রাথমিক বিদ্যালয়	মোট সংখ্যা	৫৪৭	২০৩	১৫৯	১৮৫	২০০১(প্রা.শি.অ, ২০০৩)
	মাধ্যমিক বিদ্যালয়	মোট সংখ্যা	১১৭	৬০	২৩	৩৪	২০০২ (ব্যানবেইস, ২০০৩)
	মহাবিদ্যালয়	মোট সংখ্যা	১৮	৮	৫	৫	২০০২ (ব্যানবেইস, ২০০৩)
অর্থনীতি	কৃষি শ্রমিক	মোট গ্রামীণ গৃহস্থের %	৩১	২৬	২৭	২১	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
	কৃষি প্রধান পরিবার	মোট গ্রামীণ গৃহস্থের %	৭৪	৮১	৭৪	৭০	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
	অকৃষি প্রধান পরিবার	মোট গ্রামীণ গৃহস্থের %	২৬	১৯	২৬	৩০	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
	মোট চাষের জমি	হেক্টর	৫৯,৫৬৩	২৩,৩৫৭	১৭,৩৩০	১৮,৮৭৫	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
	এক ফসলী	মোট কৃষি জমির (%)	৪৩	২২	৩৫	২৭	২০০৩ (বাংলাপিডিয়া, ২০০৩)
	দো ফসলী	মোট কৃষি জমির (%)	৪৪	৫৮	৪৪	৫৩	২০০৩ (বাংলাপিডিয়া, ২০০৩)
	তিন ফসলী	মোট কৃষি জমির (%)	১৩	১৯	২১	১৯	২০০৩ (বাংলাপিডিয়া, ২০০৩)
	প্রতি ০.০১ হেক্টর জমির মূল্য	টাকা	৭,৫০০	৪,০০০	৫,০০০	৫,০০০	২০০৩ (বাংলাপিডিয়া, ২০০৩)
শিক্ষা	সাক্ষরতার হার (৭ বছর$^{+}$)	%	৪৮	৫৪	৩৯	৪৭	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার	৬-১০ বছর শিশু (%)	১৩৪	১০০	২০৪	১০১	২০০১(প্রা.শি.অ, ২০০৩)
	মেয়ে	৬-১০ বছর শিশু (%)	১০৩	১০১	১০৫	১০৪	২০০১(প্রা.শি.অ, ২০০৩)
স্বাস্থ্য	সক্রিয় টিউবওয়েল	সংখ্যা	৭,৪৪২	২,৫৫৫	২,৪০৪	২,৪৮৩	২০০২ (ডি.পি.এইচ.ই, ২০০৩)
	কল অথবা নলকূপের পানির সুবিধাপ্রাপ্ত ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	৯৫	৯৭	৯০	৯৯	১৯৯১(বি.বি.এস.,১৯৯৪)
	স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার সুবিধাপ্রাপ্ত ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	৮	১১	৬	৭	১৯৯১(বি.বি.এস.,১৯৯৪)

প্রকৃতি ও পরিবেশ

পুরাতন গাঙ্গেয় পলল ভূমিতে অবস্থিত নড়াইল জেলা প্রাকৃতিক নানা কারণে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

প্রাকৃতিক পরিবেশ

জলবায়ু : জেলার জলবায়ু ক্রান্তীয় মৌসুমী জলবায়ুর দ্বারা প্রভাবিত। উচ্চ তাপমাত্রা ও জ্বলীয় বাষ্প এবং মাঝারি ধরনের বৃষ্টিপাত দেখা যায়। এপ্রিল থেকে জুন মাস পর্যন্ত গ্রীষ্মকাল। সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ১১.৫° সে থেকে ৩৬° সেলসিয়াসের মধ্যে থাকে। জুলাই-আগষ্ট মাসের দিকে সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত লক্ষ্য করা যায়। বার্ষিক গড়ে প্রায় ১,৭৫০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। বাতাসের আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৬৭%-৮৮% এর মধ্যে থাকে।

জলবায়ু	সমভাবাপন্ন
তাপমাত্রা	১১.৫° সেঃ - ৩৬° সেঃ
আপেক্ষিক আর্দ্রতা	৬৭% - ৮৮%
বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত	প্রায় ১,৭৫০ মিঃ মিঃ

নদী : জেলার প্রধান নদীগুলো হল মধুমতি, নবগঙ্গা, চিত্রা এবং ভৈরব। নদীগুলো সব মিলিয়ে জেলার প্রায় ২৯ বর্গ কিলোমিটার এলাকা (২.৯৬%) জুড়ে আছে। নদীগুলো জোয়ার-ভাটার দ্বারা অল্প মাত্রায় প্রভাবিত এবং প্রায় সারা বছরই নৌ চলাচলের উপযুক্ত থাকে। তবে পানি প্রবাহ হ্রাস ও পলি পরার কারণে নদীগুলোর গতিপথ পাল্টাচ্ছে। প্রধান নদীগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে দেয়া হল।

নবগঙ্গা : নবগঙ্গা মাথাভাঙ্গার একটি শাখা নদী। চুয়াডাঙ্গা শহরের নিকটে এর উৎপত্তি। উৎস মুখ হতে পূর্বদিকে কিছু পথ যাওয়ার পর একটি বিলের মাঝে নবগঙ্গার পথরুদ্ধ হয়ে যায়। ১৯৩০ সালে এর ভরাট মুখ সংস্কার করা হয়। এটা গজনবী ঘাট নামে পরিচিত। চুয়াডাঙ্গা এবং ঝিনাইদহ জেলা অতিক্রম করে মাগুরা জেলার নিকট কুমারের সাথে মিশেছে। বস্তুত, মাগুরার পরবর্তী নবগঙ্গা কুমার নদীর বর্ধিত সংস্করণ। নদীটির দৈর্ঘ্য ২৩০ কিলোমিটার। তন্মধ্যে চুয়াডাঙ্গার অংশ ২৬ কিলোমিটার। নদীটির সম্পূর্ণ যাত্রাপথই আঁকাবাঁকা। তবে ভাঙন প্রবন নয়।

মাথাভাংগা হতে গঙ্গার নবরূপ, এভাবে নবগঙ্গার নামকরণ করা হয়েছে বলে অনুমিত হয়। কালাচাঁদপুর হতে লোহাগাড়া এবং কালিয়া উপজেলার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গাজীরহাটে চিত্রার সাথে মিলিত হয়েছে। কালাচাঁদপুর হতে আরো কিছু দূর অগ্রসর হয়ে নবগঙ্গা ও চিত্রার এই মিলিত স্রোত দৌলতপুরের নিকট ভৈরবে মিশেছে। প্রায় দশ কিলোমিটার লম্বা একটি কাটা খালের সাহায্যে নবগঙ্গার অধিকাংশ পানি প্রবাহ নড়াইল সদর উপজেলার রথভাঙ্গায় চিত্রায় পতিত হয়েছে। মাগুরা হতে খুলনাগামী লঞ্চ কালাচাঁদপুরের পর উল্লিখিত কাটাখাল দিয়ে চিত্রা হয়ে যাতায়াত করে। গড়াই মধুমতি নদীর কৃত্রিম খালের সাহায্যে এই নদীর দুই জায়গায় সংযোগ রয়েছে। প্রথমটি লোহাগাড়ায় এবং দ্বিতীয়টি বরদিয়ায়। ইদানীং লক্ষ্য করা গেছে যে, গড়াই মধুমতির মূল স্রোতের অধিকাংশই বরদিয়াতে নবগঙ্গা দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। মধুমতি ও নবগঙ্গা নদীর মধ্যে নৌ যোগাযোগ স্থাপনের জন্য কালিয়া উপজেলার কোটাকোল থেকে মৌলি পর্যন্ত একটি খাল খনন করা হয়েছে। এটি 'হেলিক্যাক্স কাট' নামে পরিচিত।

চিত্রা : চুয়াডাঙ্গা ও দর্শনার মধ্যবর্তী নিম্নাঞ্চল হতে চিত্রার উৎপত্তি। এটা দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে দর্শনা, কালীগঞ্জ, শালিখা ও কালিয়া উপজেলার ভিতর দিয়ে প্রায় ১৩০ কিলোমিটার প্রবাহিত হয়ে গাজীরহাটে নবগঙ্গার

সাথে মিলিত হয়েছে। পরবর্তীতে এই মিলিত স্রোত খুলনার দৌলতপুরের নিকট ভৈরবে পড়েছে। চিত্রা বেশ পুরনো নদী। ১৭৫৭ সালে রেনল বুনাকাঠীতে এই নদী অতিক্রম করেন। তবে তার প্রতিবেদনে নদীতে জোয়ার-ভাটার প্রভাব ব্যতিরেকে আর বিশেষ কিছুর উল্লেখ পাওয়া যায় না।

বেগবতী চিত্রার এক উল্লেখযোগ্য উপ-নদী। এটি শালিকা উপজেলায় খাতুর মাগুরার নিকট চিত্রার সাথে মিলিত হয়েছে। নড়াইল উপজেলার কালাচাঁদপুর হতে নবগঙ্গার একটি শাখা রথডাঙ্গায় চিত্রার সাথে মিলিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে নবগঙ্গার এই শাখার প্রবাহের কারণেই চিত্রা নদী নাব্য। একটি খাল শালিকা উপজেলার নিম্নাঞ্চলের পানি বহন করে গোবরহাটে চিত্রার সাথে মিলিত হয়েছে। তারপর চিত্রা আঠারবাঁকী নদীতে গিয়ে পড়েছে।

ভৈরব : ভৈরব যশোর-খুলনা এলাকার দীর্ঘতম নদী। এই নদীর মোট দৈর্ঘ্য ২৪৮ কিলোমিটার। মালদহের যেখানে শ্রুতকীর্তি পদ্মায় পড়েছে তারই অপর পাড়ে ভৈরবের উৎপত্তি। বেশ কিছু পথ অতিক্রম করার পর ভৈরব পদ্মার অপর এক দক্ষিণবাহী নদী জলঙ্গীর সাথে মিশেছে। যুক্ত প্রবাহ হতে মুক্ত হওয়ার পর ভৈরব মেহেরপুরের পশ্চিম পাশ দিয়ে মাথাভাঙ্গার সাথে মিশেছে। দর্শনা রেল স্টেশনের দক্ষিণ-পূর্ব কোণ হতে ভৈরব মাথাভাঙ্গা হতে বিচ্যুত হয়ে যশোরে প্রবেশ করে কোটচাঁদপুর পর্যন্ত পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়ে পরে দক্ষিণাভিমুখী হয়েছে।

এক সময়ে ভৈরব নদী ছিল ভয়ঙ্কর। তার গর্জন এবং প্রচণ্ড তাণ্ডবে লোকজন ছিল ভীত সন্ত্রস্ত। ভৈরব একটি তীর্থ নদী হিসেবে পরিচিত। খুলনা ও যশোরের সভ্যতা ও কৃষ্টি বস্তুত এই নদীর কল্যাণে গড়ে উঠেছে। এই দুটি শহরও এই নদীর তীরে অবস্থিত। সুফী সাধক হযরত খান জাহান আলী এই নদী পথেই গৌড় হতে বড়বাজার হয়ে বাগেরহাট যান বলে অনুমান করা হয়। সম্রাট আকবরের আমলে যশোরাধিপতি প্রতাপাদিত্যকে দমন করার জন্য মোঘল সেনাপতি মানসিংহ তার বিশাল বাহিনী নিয়ে ভৈরব নদী অতিক্রম করেছিলেন বলে ইতিহাসে প্রমাণ পাওয়া যায়।

বর্তমানে বর্ষায় এই নদীতে পদ্মার পানি প্রবেশ করে কিন্তু শুকনো মৌসুমে শুকিয়ে যায়। এ সময় স্থানীয় বৃষ্টি এবং নিম্নাঞ্চলের চুয়ানো পানিই থাকে নদীর পানির একমাত্র উৎস। নদীর নিম্নাঞ্চলে জোয়ার-ভাটা খেলে। তাই নদীর নিম্নাঞ্চল নাব্য এবং চলাচলের উপযোগী।

মাটি : গাঙ্গেয় বদ্বীপে অবস্থিত নড়াইল জেলার ভূ-ভাগ অসংখ্য খাল-বিল, নদী-নালা ও জলাশয়ে পরিপূর্ণ। জেলার উপর দিয়ে প্রবাহিত নদীগুলো ছিল পদ্মার জলাধারপুষ্ট। কিন্তু বর্তমানে পদ্মার মূল প্রবাহ সরে যাওয়ায় নদীগুলো মূল সংযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন। জেলার উত্তরাংশ শুষ্ক অঞ্চলে পরিণত হয়েছে। দক্ষিণাংশের নদীগুলোর তীব্রতা হ্রাস পেয়েছে। নড়াইল জেলা বাংলাদেশের মৃতপ্রায় বদ্বীপ অঞ্চলের অংশ বিশেষ। জেলার দক্ষিণাংশ 'ফরিদপুরের নিম্নাঞ্চল'-এর অনুরূপ। জেলার সমভূমি গঠনে পদ্মা ও তার প্রধান দুটি শাখা মাথাভাঙা ও গড়াই -এর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। পদ্মা ও তার শাখা দ্বারা নড়াইলের মৃত্তিকা গঠিত। ভূ-পৃষ্ঠের উপরের স্তরে কাদা, পলি ও শুষ্ক বালি বিদ্যমান। এই স্তরের গভীরতা ১২ মিটার থেকে ৪৫ মিটার। এর নীচের স্তরে রয়েছে সুক্ষ্ম বালির সাথে মধ্যমাকৃতি ও মোটাকৃতির বালি। জেলার মাটি প্রধানত বেলে, এটেল ও দো-আঁশ থেকে এটেল, হালকা বাদামী থেকে গাঢ় ধূসর বর্ণের ও স্বল্প গভীরে কিংবা সর্বাংশেই চুনযুক্ত। গুনগত সাদৃশ্য বিচার করে এসব মাটিকে মোটামুটিভাবে (১) চুনযুক্ত পলি, (২) চুনযুক্ত বাদামী মাটি, (৩) চুনবিহীন বাদামী মাটি (৪) চুনযুক্ত গাঢ় ধূসর মাটি, (৫) চুনবিহীন গাঢ় ধূসর মাটি এবং (৬) পীট বা জৈব মাটি রূপে ভাগ করা যায়।

পুরাতন গাঙ্গেয় পললভূমি দ্বারা এই জেলার অধিকাংশ এলাকা গঠিত। এখানকার মাটি মূলত নদীবাহিত পলি দিয়ে গঠিত যার মধ্যে কিছু পরিমাণ বালির মিশ্রণ আছে। জেলার দক্ষিণাঞ্চলের মাটি কিছুটা ক্ষারীয়। মাটিতে কিছু পরিমাণ লবণাক্ততা আছে। জেলায় সর্বোচ্চ ৮ পি.পি.এম. লবণাক্ততা দেখা যায়, যা এলাকার ফসলের প্রকৃতি ও উৎপাদনে প্রভাব বিস্তার করে ।

বিল : নড়াইল জেলায় বেশ কিছু বিলও দেখতে পাওয়া যায়। এদের মধ্যে বাগডাঙ্গা বিল, ধানবের, কুমারিয়ার বিল, ঢালনের বিল, শিলুয়ার বিল, গোয়াখোলা-হাটিয়ারা বিল, আফরা বিল, কাঠুরিয়া বিল, দেবাঙ্গ বিল, বকরির বিল, মালতী বিল, বড়নাল বিল, চাঁচুরির বিল অন্যতম।

উদ্ভিদ ও প্রাণী বৈচিত্র্য : জেলার জলবায়ু ও মাটির ধরন এখানকার উদ্ভিদ ও জীব জগতে বৈচিত্র্য এনেছে। জেলার উদ্ভিদ ও প্রাণী বৈচিত্র্যের একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নীচে দেয়া হলো।

উদ্ভিদ : নড়াইল জেলার প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই গাছ-পালা দেখা যায়। আম, সুপারি, কাঁঠাল, জাম, কলা, নারিকেল, খেজুর গাছ ও তাল গাছ প্রায় প্রতিটি বাগানেই দেখা যায়। জলপথ ও জলাধারগুলোর আশপাশে হিজল, জারুল, ভাঁদি, মাদার গাছ দেখা যায়। তল্লা বাঁশও প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। এ ছাড়া আরো দেখা যায় বাবলা, সফেদা, কদবেল, বেল, আতাফল, পিটরাজ, কামরাঙ্গা, পেপে, জাম্বুরা, শিশু, মেহেন্দি, সাজনা, পেয়ারা, ডালিম, বকফুল, বরই, শেওড়া, রেইনট্রি, বট, অশ্বথ, নিম, শিমুল, পলাশ, কৃষ্ণচূড়া, নাগেশ্বর, দেবদারু, কাঠবাদাম। কৃষি জমিতে বিভিন্ন ধরনের ফসলও চাষ হয় যেমন আমন, আউশ, পাট, সরিষা, খেসারী, মসুর, গম, শীম, মরিচ, রসুন, তামাক, আদা কলা ও সুপারির বাগানও দেখা যায়।

জলাভূমিতে পানিফল, গুঁড়িপানা, কচুরীপানা, পদ্ম, শাপলা, কলমি, হেলেঞ্চা দেখা যায়। সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন শোভা বর্ধনকারী গাছ যেমন বেলি, নাইট কুইন, জবা, কামিনী, রজনীগন্ধা, গন্ধরাজ, গোলাপ লাগানো হয়ে থাকে।

প্রাণী : স্তন্যপায়ী প্রাণীর মধ্যে শিয়াল, বনবিড়াল, বেঁজি, বড় বেঁজি, বাদুর, কাঠবিড়ালি, ইঁদুর দেখা যায়। পাখিদের মধ্যে বট শালিক, ঝুটি শালিক, বাবুই, চড়ুই, কাক, বুলবুলি, দোয়েল, মুনিয়া, ছোট ফিঙ্গে, দাড় কাক, মাছরাঙ্গা, কাঠ ঠোকড়া, হলদে পাখি, কালিপেচাঁ, পানকৌড়ি, বড় সাদা বক, করচে বক, ছোট বক, ছোট শরালি, বেলে হাঁস, লালচিল, ডাহুক, ছোট হরিয়াল, বটকুল, তিলা ঘুঘু, টিয়া, কোকিল, লক্ষ্মীপেচাঁ, অন্যতম। এ ছাড়া জেলার জলাভূমি, বিল ও বাওরগুলোতে শীতকালে বেশ কিছু জাতের অতিথি পাখী দেখতে পাওয়া যায়। যেমন ভূঁটি হাঁস, কালো হাঁস, লেজা হাঁস, সাচকা, রাজহাঁস, ছোট জিরা, কাদাখোচা, চ্যাগা, খঞ্জন, সাদা খঞ্জন, জিরিয়া হাঁস, চখাচখি, কোশাই পাখি, বামুনিয়া হাঁস প্রভৃতি।

নড়াইল জেলায় মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণের জন্য বেশ কয়েকটি মৎস্য অভয়ারন্য স্থাপন করা হয়েছে। গোয়াখোলা-হাটিয়ারা বিল, কাঠুরিয়া বিল, মালতী বিল, আফরা বিল, দেবাঙ্গ বিল, বকরির বিল, শিলুয়ার বিল, ধানবের, কুমারিয়ার বিলে এই অভয়ারন্যগুলো অবস্থিত।

কৃষি সম্পদ

কৃষি জমি : জেলার অর্থনীতিতে কৃষিকাজের গুরুত্ব অপরিসীম। কৃষি শুমারী (১৯৯৬) থেকে দেখা যায় যে মোট আবাদকৃত জমির ৩৯% উঁচু জমি, ৩৩% মাঝারি জমি এবং ২৮% নীচু জমি। জেলার অধিকাংশ এলাকায় মাঝারি ও নীচু জমিতে বর্ষাকালে পানি জমে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়ে থাকে।

কৃষি জমির ব্যবহার	
উচ্চ ফলনশীল জাতের আউশ	০.৫০%
উচ্চ ফলনশীল জাতের আমন	৫.৩১%
উচ্চ ফলনশীল জাতের বোরো	৫.৪৯%
স্থানীয় জাতের ধান	৫৮.৫৭%
গম	৪.০৭%
আলু	০.১৮%
সবজি	০.৯০%
মসলা	২.৪১%
ডাল	১৪.৯৮%
তেল বীজ	৬.১৯%
আখ	১.৩৯%

প্রধান ফসল : কৃষি শুমারী (১৯৯৬) থেকে দেখা যায় যে, প্রায় ৯৯ হাজার হেক্টর জমিতে কৃষিকাজ করা হয়ে থাকে। জেলার প্রধান ফসল ধান (প্রায় ৭০% জমিতে ধান চাষ করা হয়ে থাকে)। বোরো, আমন ধান চাষ এবং উচ্চ ফলনশীল জাতের ধান চাষ করা হয়ে থাকে। এ ছাড়া অন্যান্য অর্থকরী ফসলের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার ডাল, মসলা, সবজি, মরিচ, আখ ও আলু অন্যতম। সামগ্রিকভাবে শস্য নিবিড়তার মান ১৮৩, যা উপকূল অঞ্চলের ও বাংলাদেশের শস্য নিবিড়তার তুলনায় অনেক বেশি। এই জেলা থেকে রপ্তানীকৃত প্রধান কৃষিজাত শস্য হল পান, নারিকেল, সুপারি ও চিংড়ি মাছ।

পশু সম্পদ : নড়াইলে ৫৯% গ্রামীণ বাড়িতে গবাদিপশু আছে এবং বাড়ি প্রতি গবাদিপশুর পরিমাণ গড়ে ২.৬০। এই হার উপকূলীয় গড়ের সমান।

নদী-বিলের মাছ : নড়াইল জেলার অভ্যন্তরীণ নদ-নদী ও বিল থেকে প্রচুর পরিমাণ মাছ ধরা হয়, যা একদিকে যেমন লোকের খাদ্যের মান বজায় রাখতে সাহায্য করে তেমনি জেলার অর্থনীতিতেও অবদান রাখে। ২০০১-০২ সালের হিসাবে দেখা যায় যে, জেলার নদ-নদী ও জলাভূমি থেকে প্রায় ৩ হাজার মেট্রিক টন মাছ ধরা হয়েছে, যা উপকূলীয় অঞ্চলের প্রায় ১%।

মাছ চাষ : ২০০১-০২ সালের হিসাব থেকে দেখা যায় যে, জেলার পুকুরগুলো থেকে প্রায় ৪ হাজার মে.টন মাছ উৎপাদিত হয়েছে (উপকূলের প্রায় ১%)। নড়াইল জেলার বিলগুলোতে বর্তমানে সমাজভিত্তিক মাছ চাষের ব্যপক উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

দুর্যোগ

নদী ভাঙন : নবগঙ্গা ও মধুমতি নদীর প্রায় ৩০ কিলোমিটার এলাকা ভাঙনকবলিত। লোহাগড়া ও কালিয়া উপজেলার একটি বিশাল অংশ ইতিমধ্যেই নদীবক্ষে বিলীন হয়ে গিয়েছে। নদী ভাঙনের ফলে লোহাগড়া ও কালিয়া উপজেলার মানচিত্র বদলে যাচ্ছে। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামগুলো হল গোপালপুর, শালনগর, আমডাঙ্গা, আড়াইড়া, শেবার, পানাইল, বকজুড়ি, ধনিয়ার, আসতাইল, ভাটিয়াপাজ, কালনা, চর কালনা, ইটনা, ধলইতলা, কুমারডাঙ্গা, মল্লিকপুর, মাকরাইল, রামকান্তপুর, যোগা, কোটাখোলা, মহাজন, গোসাইবাড়িয়া, ইসলামপুর, বরদিয়া, পাটনা, সুকতোগ্রাম, চাঁদেরচর, কালিয়া, বরইপাড়া, মধ্যপাশা ও বিষণা।

নবগঙ্গা নদীর প্রবলস্রোতে পাঁচ বছর আগে পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নির্মিত চাঁদের চর রিং বাঁধ সম্প্রতি ভেঙে নদীর পানি প্রবল বেগে লোকালয়ে ঢুকে পড়েছে। বোর্ডের সূত্র থেকে জানা যায় যে ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরে ৩ কিলোমিটার লম্বা এবং ১৪ ফুট চওড়া বিকল্প বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ করা হয়। জরাজীর্ণ স্লুইস গেটের কারণে পানি পার্শ্ববর্তী বিল ও জলাশয়ে ঢুকে পরে।

নদী ভরাট : বিশ্ববরেণ্য চিত্রকর এস.এম. সুলতানের স্মৃতিবিজড়িত চিত্রা নদী ক্রমেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। ১২০ কিলোমিটার দীর্ঘ এই নদীর একটি বড় অংশ এখন শুকনো মাঠ ও ফসলের ক্ষেত। বাকি অংশ ক্ষীণ ধারায় বয়ে চললেও এক সময়ের ভরাযৌবনা চিত্রার জলরাশিও দিন দিন কমে আসছে। নদী শুকিয়ে যাওয়ায় বিরূপ প্রভাব পড়েছে এ অঞ্চলের পরিবেশের উপর। নদীর দু'পাড়ের কয়েকশ' গ্রামের মানুষ সেচ, গোছলসহ ঘর-গৃহস্থালির কাজের পানির জন্য নির্ভরশীল ছিল এই নদীর উপর। কিন্তু নদী শুকিয়ে যাওয়ায় সেচ সংকট মারাত্মক রূপ নেয়। নদীটিতে জোয়ার-ভাটার খেলা ছিল দু'শত বছরের বেশি সময় ধরে। কিন্তু পলি জমে নদীর তলদেশ ভরাট হওয়া, অপরিকল্পিত বাঁধ, ব্রীজ নির্মাণ ও ফারাক্কার প্রভাবে অল্প কিছুদিন হল নদীর একটি বড় অংশে জোয়ার-ভাটা বন্ধ হয়ে যায়। নদী বিশেষজ্ঞদের মতে সামান্য ড্রেজিংয়ে এই নদীর গতি প্রবাহ বাচাঁনো সম্ভব। তবে এই কাজে যতদ্রুত সম্ভব শুরু করা দরকার।

নদীর পানি প্রবাহ হ্রাস : নড়াইল জেলার নদী নালা এক সময় স্রোতঃস্বিনী ছিল। অধিকাংশ নদীর পানির মূল উৎস ছিল পদ্মা। কিন্তু ভারত ফারাক্কায় গঙ্গাঁ নদীতে বাঁধ দেয়ায় পানি প্রবাহ অনেক কমে গেছে। আস্তে আস্তে অনেক নদী, খাল-বিল শুকিয়ে যাচ্ছে।

বন্যা : নড়াইল জেলায় বন্যা একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ। সবগুলো উপজেলাই কম বেশি বন্যা আক্রান্ত হয়। ২০০২ সালের বন্যায় এই জেলার বেশ কিছু এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

আর্সেনিক : বি.জি.এস. ও ডি.পি.এইচ.ই র একটি গবেষণা (২০০১) থেকে দেখা গেছে যে, নড়াইল জেলার নলকূপগুলোতে আর্সেনিকের গড়মাত্রা ৮৮ মাইক্রোগ্রাম/লিটার। সমীক্ষাটিতে আরো দেখা গেছে নলকূপগুলোর মধ্যে ৪২ শতাংশেই আর্সেনিকের মাত্রা ৫০ মাইক্রোগ্রাম/লিটারের চেয়ে বেশি ।

মাটি ও পানির লবণাক্ততা : নড়াইল জেলার মাটি লবণাক্ততার মাত্রা সর্বোচ্চ ৮ পি.পি.এম। লবণাক্ততা একদিকে যেমন সুপেয় পানির প্রাপ্যতা কমিয়ে দেয় অপরদিকে বিভিন্ন ধরনের রোগেরও কারণও হয়ে থাকে। অপরদিকে মাটিতে লবণাক্ততার জন্য সব ধরনের ফসলও হয় না এবং মিঠা পানির অভাবে সব সময় সেচও দেয়া যায় না।

জলাবদ্ধতা : জেলায় মাঝারি নিচু জমিগুলো বর্ষা মৌসুমের শুরুতেই প্লাবিত হয় এবং পানি সরে যাওয়ার কোন সুষ্ঠু ব্যবস্থা না থাকায় ৫/৬ মাস পর্যন্ত এভাবেই থেকে যায়। মধুমতি ও নবগঙ্গা নদীর মধ্যবর্তী স্থানে নিচু জমি বেশি থাকার কারণে জলাবদ্ধতা দেখা দেয়। নদীগুলো পলি পড়ে শুকিয়ে যাওয়ার কারণেও জলাবদ্ধ হচ্ছে। তবে শুধু যে ভূ-প্রাকৃতিক কারণেই নড়াইলে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয় তা নয়, অপর্যাপ্ত পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা, নদীর গতিপথ ও পানিপ্রবাহের দিক পরিবর্তন, অপরিকল্পিত অবকাঠামো নির্মাণ, নদীতে পলি পড়ার হার পরিবর্তন, জলা পথগুলো ভরাট হয়ে যাওয়া প্রভৃতি কারণে এখন নড়াইলের অনেক এলাকাই জলাবদ্ধ হচ্ছে।

পানির স্তর নীচে নেমে যাওয়া : এই জেলায় কৃষি জমির একটি বড় অংশ ভূ-গর্ভস্থ পানি দিয়ে সেচ দেয়া হয়। খরা ও অনাবৃষ্টির ফলে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নীচে নেমে যায়। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে অস্বাভাবিকভাবে পানির স্তর নীচে নেমে যাওয়ার ফলে বড় ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের আশংকা দেখা দিয়েছে। গত দশ বছরে পানির স্তর অন্তত ১১ থেকে ১২ ফুট নেমে গিয়েছে। নব্বই দশকের গোড়ার দিকে এ অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে ১২ থেকে ১৪ ফুটের মধ্যে পানির স্তর পাওয়া যেত। এখন সেটা ২৪ ফুটেও মিলছে না।

বিপদাপন্নতা

বিপদাপন্নতা শব্দটি মানুষের জীবনে বিভিন্ন নেতিবাচক ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা এবং সেই নেতিবাচক ঘটনার সাথে মানুষের অভিযোজনের ক্ষমতাকে বুঝিয়ে থাকে। বিপদাপন্নতার ধরণ, প্রকার ও ব্যপ্তিতে ভিন্নতা আছে। সব রকম বিপদাপন্নতা দ্বারা যেমন জেলার সব এলাকা আক্রান্ত হয় না, তেমনি সব পেশার, সব শ্রেণীর মানুষও সমানভাবে বিপদাপন্ন হয় না। উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষের বিপদাপন্নতার উপর পরিচালিত একটি গবেষণায় (সি.ই.জি.আই.এস., ২০০৪) দেখা যায় যে, নড়াইলের মানুষ প্রাকৃতিক এবং আর্থ-সামাজিক কারণে বেশি বিপদাপন্ন হয়। নড়াইলের ক্ষুদ্র কৃষকেরা জমির উর্বরতা হ্রাস, নদীর পানি প্রবাহ হ্রাস (প্রধানত গড়াই নদীর), কৃষি জমির অভাব, পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার অভাব, খরা, আর্সেনিক দূষণ, পানিতে মাত্রাতিরিক্ত লোহা, কৃষি উপকরণের অতিরিক্ত মূল্য, স্বাস্থ্য ও শিক্ষাসেবার অভাব প্রভৃতি কারণে প্রধানত বিপদাপন্ন হয়। জেলেদের ক্ষেত্রে জলাভূমির পরিমাণ কমে যাওয়া, মাছের রোগ, খরা, নদীর পানি প্রবাহ হ্রাস, অতিরিক্ত মাছ ধরা, আইন-শৃঙ্খলা, শিক্ষা সেবার অভাব ইত্যাদি প্রধান বিপদাপন্নতা হিসেবে দেখা দেয়। অপরদিকে গ্রামীণ ও শহুরে শ্রমিকরা নিম্ন মজুরি, বছরব্যাপী কাজের সুযোগের অভাব, বাসস্থানের সমস্যা, নিম্ন দক্ষতা, স্বাস্থ্য সেবার অভাব, পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থার অভাব, আইন-শৃঙ্খলা, আর্সেনিকের প্রকোপের কারণে বিপদাপন্ন হয়।

নড়াইল জেলার কিছু পেশাজীবীদের বিপদাপন্নতা

ক্ষুদ্র কৃষক	জমির উর্বরতা হ্রাস, নদীর পানি প্রবাহ হ্রাস (প্রধানত গড়াই নদীর), কৃষি জমির অভাব, পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার অভাব, খরা, আর্সেনিক দূষণ, পানিতে মাত্রাতিরিক্ত লোহা, কৃষি উপকরণের অতিরিক্ত মূল্য, স্বাস্থ্য ও শিক্ষাসেবার অভাব, ইত্যাদি।
জেলে	জলাভূমির পরিমাণ কমে যাওয়া, মাছের রোগ, খরা, নদীর পানি প্রবাহ হ্রাস, অতিরিক্ত মাছ ধরা, আইন-শৃঙ্খলা, শিক্ষা সেবার অভাব, ইত্যাদি।
গ্রামীণ শ্রমিক	নিম্ন মজুরি, বছরব্যাপী কাজের সুযোগের অভাব, জমির অভাব, জমির উর্বরতা হ্রাস, নদীর পানি প্রবাহ হ্রাস, আর্সেনিকের প্রকোপ, আইন-শৃঙ্খলা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবার অভাব, ইত্যাদি।
শহুরে শ্রমিক	নিম্ন মজুরি, বছরব্যাপী কাজের সুযোগের অভাব, বাসস্থানের সমস্যা, নিম্ন দক্ষতা, স্বাস্থ্য সেবার অভাব, পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থার অভাব, আইন-শৃঙ্খলা, আর্সেনিকের প্রকোপ, ইত্যাদি।

উৎস: সি.ই.জি.আই.এস., ২০০৪

জীবন ও জীবিকা

জনসংখ্যা

নড়াইল জেলার মোট জনসংখ্যা ৬.৯৪ লাখ। এর মধ্যে ৩.৫০ লাখ পুরুষ এবং ৩.৪৪ লাখ নারী। লিঙ্গ অনুপাত ১০০:১০২। মোট জনসংখ্যার ৯০% লোক গ্রামে বাস করে। জেলায় মোট খানা/ পরিবারের সংখ্যা ১.৪ লাখ। প্রতিটি খানার গড় আকার ৫.০ জন, যা উপকূলীয় অঞ্চল গড়ের তুলনায় অনেক বেশি। নড়াইল জেলায় প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৭০২ জন লোক বাস করে, যা উপকূলীয় অঞ্চল গড়ের তুলনায় অনেক কম। উপজেলাগুলোর মধ্যে কালিয়া উপজেলায় সবচেয়ে কম লোক বাস করে ।

শহুরে জনগণ (লাখ)	০.৬৭
পুরুষ	০.৩৫
নারী	০.৩৩
গ্রামীণ জনগণ (লাখ)	৬.২৭
পুরুষ	৩.১৬
নারী	৩.১১
লিঙ্গ অনুপাত	১০০:১০২
নির্ভরশীল জনগণের অনুপাত	০.৮৫
জনসংখ্যার ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কি.মি.)	৭০২

জেলার মোট জনসংখ্যার ৩৯% ০ - ১৪ বছর বয়সী, যা উপকূলীয় অঞ্চলের হারের তুলনায় কম। অপরদিকে ৭% লোকের বয়স ৬০ বছরের উর্ধ্বে। তাই বয়সগত দিক দিয়ে এই জেলার জনগণের নির্ভরশীলতার অনুপাত ০.৮৫, যা উপকূলীয় অঞ্চলের তুলনায় কম।

২০০১ সালের আদম শুমারী অনুযায়ী মাত্র ১০% লোক শহরাঞ্চলে বাস করে। এই অনুপাত ১৯৯১ সালেও ছিল ১০%। ১৯৯১ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত শহরাঞ্চলে বাসকারী লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ১%।

জনস্বাস্থ্য

জনগণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই জেলায় ১টি সদর হাসপাতাল ও ২টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স আছে। হাসপাতালগুলোতে মোট শয্যাসংখ্যা ১১০টি এবং শয্যাপ্রতি জনসংখ্যার অনুপাত ৬,৩২২। এই অনুপাত উপকূলীয় অঞ্চলের চেয়ে অনেক বেশি, যা স্বাস্থ্য সেবার দুরবস্থার কথা তুলে ধরে। যদিও ৩টি বেসরকারি হাসপাতাল ও ৭টি গ্রামীণ ডিসপেনসারি রয়েছে, কিন্তু তাদের সেবার পরিমাণ যথেষ্ট নয়।

শিশু স্বাস্থ্য : এই জেলার নবজাতক মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৫২ এবং পাঁচ বছর বয়সী শিশুর মৃত্যুর হার ৯৪। ১২-৫৯ মাস বয়সী শিশুদের মধ্যে ৭% অপুষ্টির শিকার। এই হার উপকূলীয় গড়ের চেয়ে অনেক বেশি। মেয়ে শিশুরা অপুষ্টিতে ভোগে ছেলেদের চেয়ে অনেক বেশি। অপরদিকে, ৮৬%, ৭৬% এবং ৯৯% শিশু যথাক্রমে হাম, ডিপিটি এবং পোলিও রোগের টিকা নিয়েছে। এই হার সমগ্র বাংলাদেশের গড়ের চেয়ে বেশি। জেলার ৯১% ঘরে আয়োডিনযুক্ত লবণের ব্যবহার রয়েছে।

নির্ভরশীলতার অনুপাত	০.৮৫
নবজাতক মৃত্যুর হার (প্রতি হাজারে)	৫২
অপুষ্টির মাত্রা	৭%

পানি, পয়ঃ ও বাসস্থান সুবিধা : ১৯৯১ সালের আদম শুমারী থেকে দেখা যায় যে, নড়াইল জেলার ২৪% ঘরের দেয়াল ইট বা টিনের তৈরি। এই হার উপকূলীয় গড়ের তুলনায় অনেক কম। আবার জেলার ৪৮% ঘরের ছাদ ইট বা টিনের তৈরি। এই হারও উপকূলীয় গড়ের তুলনায় কম। অপরদিকে ২০০১ সালের আদম শুমারী অনুযায়ী দেখা যায় যে, ০.৪% ঘর ট্যাপের এবং ৯৫% ঘর টিউবওয়েলের পানি ব্যবহার করে। এ ছাড়া ১.১% ঘর গভীর নলকূপের উপর নির্ভরশীল। পুকুর ও অন্যান্য উৎসের পানি ৩.২%

ঘরে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। নড়াইল জেলার লোকেরা সমগ্র উপকূলের তুলনায় ট্যাপ ও টিউবওয়েলের পানির সুবিধা বেশি পেয়ে থাকে। তবে আর্সেনিকের মারাত্মক প্রকোপ জেলার লোকদের বিপদগ্রস্ত করেছে।

একই হিসাবে আরো দেখা যায় যে, ১৪% লোকের কোন প্রকার পায়খানার সুবিধা নেই, যা সমগ্র উপকূলের তুলনায় খারাপ অবস্থা নির্দেশ করে। প্রায় ৪১% ঘরে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহৃত হয় এবং বাকি ঘরে হয় না।

শিক্ষা

নড়াইল জেলায় শিক্ষিতের হার ৪৮%। এই হার উপকূলীয় গড়ের প্রায় কাছাকাছি। মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার হার (৪৪%) পুরুষদের (৫১%) তুলনায় কম। এই জেলায় মেয়েদের মধ্যে শিক্ষিতের হার উপকূলীয় অঞ্চলের হারের চেয়ে কম। অপরদিকে, প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে শিক্ষিতের হার ৫২%। কালিয়াতে শিক্ষিতের হার সবচেয়ে কম এবং নড়াইল সদরে শিক্ষিতের হার সবচেয়ে বেশি।

শিক্ষিতের হার (৭^{+})	%
মোট	৪৮
পুরুষ	৫১
মহিলা	৪৪
শিক্ষিতের হার (১৫^{+})	
মোট	৫২
পুরুষ	৫৭
মহিলা	৪৬

এই জেলায় মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৫৪৭টি, যার মধ্যে ২৮৭টি সরকারি। এই বিদ্যালয়গুলোতে মোট ১.৩ লাখ ছাত্রছাত্রী পড়াশুনা করে, যার মধ্যে প্রায় ৪০% মেয়ে। এই জেলায় ৬ থেকে ১০ বছর বয়সী শিশুদের ভর্তির গড় হার ১৩৪%, যা উপকূলীয় গড়ের চেয়ে অনেক বেশি এবং জনসংখ্যা অনুপাতে বিদ্যালয়ের ঘনত্বও অনেক বেশি (প্রতি ১০,০০০ জনের জন্য ৮টি)। কিন্তু শিক্ষক প্রতি ছাত্রের অনুপাত (৫৭), উপকূলীয় গড়ের (৫০) চেয়ে বেশি। এই জেলায় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১১৭টি এবং এতে মোট ৫০ হাজার ছাত্রছাত্রী পড়াশুনা করে। যার মধ্যে ৫৫% ছাত্রী। জেলায় মোট মাদ্রাসার সংখ্যা ৩২টি এবং মোট ৬ হাজার ছাত্রছাত্রী সেখানে পড়াশুনা করে। এই জেলায় মোট ১৮টি কলেজ আছে যেখানে প্রায় ৭ হাজার ছাত্রছাত্রী পড়াশুনা করে। এ ছাড়া ১টি টেকনিক্যাল কলেজ, ৩টি টেকনিক্যাল স্কুল, ১টি আর্ট স্কুল, ১টি ভোকেশনাল স্কুল আছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়	৫৪৭ টি
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১১৭ টি
মাদ্রাসা	৩২ টি
কলেজ	১৮ টি

অভিবাসন

বি.বি.এস., ১৯৯১ এর সূত্রানুসারে নড়াইলের মোট জনসংখ্যার প্রায় ১০% জেলার বাইরে থেকে আগত।

সামাজিক উন্নয়ন

সাক্ষরতার হার (৭^{+} বছর বয়সী), নিরাপদ পানি সুবিধা, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ও হাসপাতালে শয্যাপ্রতি জনসংখ্যা ইত্যাদি বিষয় এলাকার সামাজিক উন্নয়নকে নির্দেশ করে। বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণ করে বলা যায়, নড়াইল জেলা সামগ্রিকভাবে সামাজিক উন্নয়নে এগিয়ে নেই।

অর্থনৈতিক অবস্থা

আয় : নড়াইল জেলার মোট আয় ১২৩ কোটি টাকা (১৯৯৯-২০০০), যা সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলের মোট আয়ের প্রায় ২%। জেলাগত মোট আয়ের দিক থেকে এই জেলা ১৮তম স্থানে আছে। জেলার মোট আয়ের ৪৫% আসে কৃষিখাত থেকে, যা উপকূলীয় হারের চেয়ে অনেক বেশি । আয়ের ৪৩% চাকরি বা সেবামূলক খাত থেকে আসে । অপরদিকে, আয়ের মাত্র ১৩% শিল্পখাত থেকে এসে থাকে। নড়াইল জেলায় মানুষের মাথাপিছু আয় মাত্র ১৬,২৪৯ টাকা (১৯৯৯/২০০০), যা উপকূলীয় অঞ্চল গড়ের চেয়ে অনেক কম। মাথাপিছু আয়ের দিকে এই জেলা উপকূলীয়

জেলাগুলোর মধ্যে ৮ম স্থানে এবং সমগ্র বাংলাদেশের মধ্যে ২১তম স্থানে রয়েছে। নড়াইল জেলায় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি প্রায় ৫ শতাংশ হারে হচ্ছে, যা উপকূলীয় অঞ্চল এবং সমগ্র বাংলাদেশের তুলনায় কম।

সক্রিয় জনশক্তি : ১৯৯৯-২০০০ সালের শ্রমশক্তি জরিপ অনুযায়ী দেখা যায় যে, এই জেলায় মোট কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা ২.১ লাখ এবং এর মধ্যে ৩৯%ই মহিলা। অপরদিকে, শহরাঞ্চলে মোট কর্মক্ষম লোকের সংখ্যা ৩৪ হাজার, যা জেলার মোট সংখ্যার ১৬%।

প্রধান জীবিকা দল

কৃষক : কৃষি শুমারী (১৯৯৬) থেকে দেখা যায় যে, গ্রামীণ জনগণের ৭৩.৬% পরিবার কৃষি কাজে জড়িত। এদের মধ্যে ৫১.০% ক্ষুদ্র কৃষক, ২০.৮% পরিবার মধ্যম এবং ১.৯% পরিবার বড় কৃষক।

কৃষি শ্রমিক : চাষের জমির অভাব, কৃষি উপকরণ ও আর্থিক সামর্থ্যের অভাবের কারণে জেলায় অনেক লোকই তাদের জীবিকার জন্য কৃষি শ্রমের উপর নির্ভরশীল। বি.বি.এস. এর কৃষি শুমারী (১৯৯৬) অনুসারে দেখা যায় যে, জেলায় গ্রামীণ পরিবারের মধ্যে ২২% পরিবার কৃষি শ্রমিক। এই হার দিনে দিনে বাড়ছে।

শহুরে শ্রমিক : নড়াইল জেলার শহরাঞ্চলে শ্রমিকের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। গ্রামাঞ্চলে কাজের অভাব, বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে লোকজন সর্বস্বান্ত হয়ে গ্রাম থেকে শহরে এসে দিন-মজুরে পরিণত হচ্ছে।

জেলে : জেলার অনেক লোক মাছ ধরার উপর নির্ভর করে থাকে। জেলার মোট গ্রামীণ কৃষক পরিবারের মধ্যে ৪% পরিবার মাছ ধরার উপর নির্ভরশীল। এদের মধ্যে অনেকেই বংশানুক্রমিকভাবে জেলে এবং প্রধানত হিন্দু ধর্মাবলম্বী।

দারিদ্র্য

এই জেলায় পুষ্টি গ্রহণের ভিত্তিতে ৪১% লোক দরিদ্রসীমার নীচে এবং ১৪% লোক অতি দরিদ্রসীমার নীচে বাস করে। এই হার উপকূল ও বাংলাদেশের হারের চেয়ে অনেক কম। আবার গ্রামীণ জনগণের ৪১% পরিবারই ভূমিহীন।

দরিদ্র	৪১%
অতি দরিদ্র	১৪%
ভূমিহীন	৪১%
ক্ষুদ্র কৃষক	৫১%

নারীদের অবস্থান

উপকূলীয় অঞ্চল ও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নড়াইল জেলার নারীদের অবস্থান কিছুটা ভিন্ন। সিপিডি-ইউএফপিএ কিছু বৈশিষ্ট্যের (যেমন জনসংখ্যার অনুপাত, শিক্ষার হার এবং অর্থনৈতিকভাবে সক্রিয় শ্রমশক্তি) উপর ভিত্তি করে লিঙ্গ সম্পর্কিত উন্নয়নসূচক তৈরি করেছে। এই হিসাব অনুযায়ী নড়াইল জেলা নিম্নমাত্রার লিঙ্গীয় অসমতাপূর্ণ জেলা। নড়াইল জেলার নারীদের অবস্থান বিশেষ কিছু সূচকের ভিত্তিতে আলোচনা করা হল।

লিঙ্গ অনুপাত : নড়াইল জেলার মোট জনসংখ্যার ৪৯% নারী। জেলার লিঙ্গ অনুপাত ১০০:১০২, যা উপকূলীয় অঞ্চল ও বাংলাদেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অপ্রাপ্ত বয়স্ক (০-১৪ বছর) জনসংখ্যায় লিঙ্গ অনুপাত ১০০:১০৮। কিন্তু প্রজননক্ষম বয়সদলে (১৫-৪৯ বছর) লিঙ্গ অনুপাত ১০০:৯৩।

প্রজনন স্বাস্থ্য : পরিবার পরিকল্পনা তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (FPMIS-১৯৯৯)-এর তথ্য অনুসারে, জেলায় মাতৃমৃত্যুর হার ৫.৪০, যা নানা প্রপঞ্চ দ্বারা প্রভাবিত। খাদ্যের অসম বন্টন, ঝুঁকিপূর্ণ সন্তান জন্মদান, আধুনিক স্বাস্থ্য সেবার অভাব যেমন, ডাক্তার, ক্লিনিক ও হাসপাতালের অভাব মায়েদের মৃত্যু হারকে প্রভাবিত করে। নড়াইল জেলার নারীরা তাদের জীবদ্দশায় গড়ে ২.৫৪ টি শিশুর জন্ম দিয়ে থাকেন এবং এই হার ধীরে ধীরে কমে আসছে। জেলার ৪১% নারী আধুনিক পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ করেছে, যা সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলের হারের (৪১%) সমান।

বৈবাহিক অবস্থা : জেলার ১০ বছর ও তার উর্ধ্বে মোট জনসংখ্যার মধ্যে ৩১% নারী বিবাহিত এবং ১% নারী স্বামী পরিত্যক্তা (বি.বি.এস., ২০০১)। এখানে বিয়ে নিবন্ধনের হার ৭৪% (বি.বি.এস.-ইউনিসেফ, ২০০১)।

শ্রমশক্তি : সমগ্র বাংলাদেশের ন্যায় উপকূলীয় অঞ্চলেও নারী পুরুষের কাজের মধ্যে ভিন্নতা দেখা যায়। নারীরা প্রধানত পারিবারিক উৎপাদন প্রক্রিয়ায় শ্রম দেয়। পর্দাপ্রথা, প্রথাগত শিক্ষা, প্রশিক্ষণের অভাব, অপ্রতুল যোগাযোগ ব্যবস্থা, কঠোর ধর্মীয় অনুশাসন ইত্যাদির প্রভাবে অকৃষিখাত বা চাকরি ও সেবামূলক খাতে নারীদের অংশগ্রহণ অনেক কম হয়ে থাকে। তবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত নারীরা নানা ধরনের কাজের সাথে যুক্ত হতে বাধ্য হয়। এ ছাড়া শিক্ষার ক্রমবিস্তার, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, এনজিওদের ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী, সরকারি ও বেসরকারি সচেতনতামূলক কার্যক্রমের ফলে প্রথাগত ক্ষেত্রে নারীদের অংশ গ্রহণ বাড়ছে। শ্রমশক্তি জরিপ (১৯৯৯/২০০০) অনুসারে ১৯৯৯-২০০০ সালে নড়াইল জেলার মোট শ্রমমক্তির ৩৯% ছিল নারী। এই হার উপকূলীয় গড়ের চেয়ে বেশি। শ্রমশক্তি জরিপ অনুযায়ী আরো দেখা যায় যে, শহরাঞ্চলে নারীদের অংশগ্রহণ (১২%), গ্রামাঞ্চলের (৪৪%) তুলনায় কম । জেলার ১৫-৪৯ বছর বয়সী নারীদের মধ্যে মাত্র ২৫% অর্থ বা খাদ্যের বিনিময়ে বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত, যা সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলে ২৬% (নিপোর্ট, ২০০৩)।

নারীর অবস্থান

- সার্বিক ও প্রাপ্ত বয়স্ক শিক্ষার হার উপকূল হারের চেয়ে অনেক কম ও বাংলাদেশ হারের চেয়ে বেশী।
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মেয়ে শিশুর ভর্তির হার বেশি।
- সক্রিয় শ্রম শক্তিতে নারীদের অংশ গ্রহণ বেশি।
- লিঙ্গ অনুপাত (১০০:১০২) নারীর প্রতিকূলে।
- মেয়ে শিশুদের মধ্যে অপুষ্টির হার অত্যন্ত বেশি।
- ঘরে বা বাড়িতে সন্তান প্রসবের হার বাংলাদেশের হারের চেয়ে বেশি।
- কৃষিজীবী গ্রামীণ পরিবারে নারী প্রধান গৃহের সংখ্যা বেশি।
- মাতৃমৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৫ জন , যা জাতীয় (৫ জন) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৫ জন) সমান ।
- জেলায় ১৩-৪৯ বয়স দলের নারীদের মধ্যে আধুনিক জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারের হার ৪১%, যা জাতীয় (৪৪%) হারের তুলনায় কম ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৪১%) সমান।

কিন্তু, শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের হারের তুলনায় নারীদের মজুরি প্রাপ্তি অনেক কম। কৃষি শুমারী (১৯৯৬) অনুযায়ী দেখা যায় যে, ২৮% নারী কৃষি কাজে অংশগ্রহণ করা সত্ত্বেও কোন প্রকার মজুরি পায় না। আবার যারা মজুরি পায় তারা পুরুষদের প্রায় তিন ভাগের দুই ভাগ মজুরি পেয়ে থাকে। এই হার প্রত্যন্ত অঞ্চলে অর্ধেকেও নেমে আসে।

স্বাস্থ্য ও পুষ্টি : স্বাস্থ্য ও পুষ্টিগতমান নারীদের অবস্থানের এক গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক। পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসেবার অভাবে নারীদের ৯৭% ঘরে সন্তান প্রসব করে থাকেন। এই হার বাংলাদেশ গড়ের চেয়ে অনেক বেশি। আবার প্রসবকালীন সময়ে ১০% ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দাই ও ৫% ক্ষেত্রে ডাক্তাররা সহায়তা করে থাকেন। ৮৫% ক্ষেত্রে আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীরা সহায়তা করে থাকেন।

এই জেলায় নবজাতক মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৫২, যা বাংলাদেশ গড়ের চেয়ে কম। কিন্তু শিশুদের মধ্যে অপুষ্টির হার অত্যন্ত বেশি। জেলার ৭% শিশুই চরম অপুষ্টির শিকার এবং মেয়ে শিশুদের মধ্যে অপুষ্টির হার (৯%) ছেলে শিশুদের চেয়ে (৫%) অনেক বেশি।

শিক্ষা : শিক্ষা ক্ষেত্রে নড়াইল জেলার নারীরা কিছুটা পিছিয়ে আছে। সার্বিক ও প্রাপ্ত বয়স্ক শিক্ষার হার (যথাক্রমে ৪৪% ও ৪৬%) উপকূল হারের চেয়ে অনেক কম ও বাংলাদেশ হারের চেয়ে বেশি। যদিও তা পুরুষদের শিক্ষার হারের তুলনায় কম। কিন্তু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মেয়েদের ভর্তির হার উপকূল হারের তুলনায় বেশি এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং মাদ্রাসাগুলোতে মোট ছাত্রছাত্রীর অর্ধেকই মেয়ে। মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে ৬০% ছাত্রী। কলেজগুলোতে প্রায় ৪০% ছাত্রী। এই অবস্থান উপকূলীয় প্রবনতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

নারী নির্যাতন : ঘরের ভেতরে-বাইরে নারীরা প্রতিনিয়তই নানা ধরনের নির্যাতনের শিকার। ঘরে নারী নির্যাতন জেলার একটি অতিপরিচিত ঘটনা।

অবকাঠামো

রাস্তা-ঘাট

এই জেলায় সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অধীনে মোট ৯৫ কি. মি. রাস্তা নির্মিত হয়েছে। এর মধ্যে আঞ্চলিক মহাসড়ক ১২ কি. মি. এবং উপজেলা সদরগুলোর মধ্যে সংযোগকারী সড়ক ৮৩ কি. মি.। এ ছাড়াও এলজিইডি-র অধীনে ৩৪৫ কি. মি. রাস্তা নির্মিত হয়েছে। সব মিলিয়ে এই জেলায় রাস্তার ঘনত্ব ০.৪৪ কি. মি./ বর্গ কি. মি., যা উপকূলীয় অঞ্চল ঘনত্বের চেয়ে অনেক কম। গ্রামাঞ্চলে রাস্তা-ঘাটের অবস্থা খুবই খারাপ।

পাকা রাস্তা	৪৪০ কি.মি.
সওজ রাস্তা	৯৫ কি.মি.
এলজিইডি রাস্তা	৩৪৫ কি.মি
রাস্তার ঘনত্ব	০.৪৪ কি.মি./ বর্গ কি.মি.

সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান

১৯৯৮ সালের হিসাব অনুযায়ী দেখা যায় যে, এই জেলায় মোট ১১১টি ক্লাব, ১টি কমিউনিটি সেন্টার, ৮৪৮টি সমবায় সমিতি, ২৯টি পেশাজীবী সংগঠন আছে। ১,৬১৫ টি মসজিদ, ১৫৩টি মন্দির ও ১টি চার্চ আছে। ৬টি পাবলিক লাইব্রেরি, ১৬০টি ক্লাব, ৪টি সিনেমা হল, ১০৪টি মহিলাদের সংগঠন, ৭টি থিয়েটার গ্রুপ, ৭টি লিটারেচি সোসাইটি, ৭টি অপেরা পার্টি ও ১২টি থিয়েটার গ্রুপ আছে। এ ছাড়া ৩০টি খেলার মাঠও আছে।

অর্থনৈতিক অবকাঠামো

ব্যাংক ও ঋণ সুবিধা : নড়াইল জেলায় প্রধান সবগুলো ব্যাংকেরই শাখা রয়েছে। এক হিসাবে দেখা যায় যে ১৯৯৯-২০০০ সালে জেলার ব্যাংকগুলোতে প্রায় এক হাজার মিলিয়ন টাকা জমা ছিল। এই সঞ্চয় ১৯৯৩-৯৪ সাল থেকে ৬৯% বৃদ্ধি পেয়েছে, যা উপকূলীয় হারের সাথে সংগতিপূর্ণ।

আরেক হিসাবে দেখা যায় যে, প্রধান চারটি ক্ষুদ্র ঋণ দানকারী এনজিও (ব্র্যাক, আশা, কারিতাস ও প্রশিকা) জেলার প্রায় ২৯% পরিবারকে ঋণ দিয়েছে। এ ছাড়া আরো অনেক স্থানীয় এন.জি.ও. ঋণ দিয়ে থাকে।

হাট-বাজার ও বন্দর : ১৯৯৬ সালের হিসাব অনুযায়ী দেখা যায় যে, নড়াইল জেলায় মোট ১৫টি হাট-বাজার কেন্দ্র রয়েছে। প্রতিটি কেন্দ্র গড়ে ৬৬ বর্গ কিলোমিটারের লোকদের সুবিধা দিয়ে থাকে; কিন্তু উপকূলীয় অঞ্চলে গড়ে প্রতি ৮০ বর্গ কিলোমিটারে একটি কেন্দ্র আছে, যা জেলার হাট-বাজারের তুলনামূলক সুবিধাজনক অবস্থার কথা তুলে ধরে।

বিদ্যুৎ ও টেলিযোগাযোগ : জেলার মোট ২০% বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগ রয়েছে। তবে শহর ও গ্রামে বৈদ্যুতিক সংযোগের ক্ষেত্রে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। শহরের মোট ৩৯% ঘরে বিদ্যুৎ সংযোগ রয়েছে। অথচ গ্রামে এর পরিমাণ মাত্র ১৭%। এই হার নগরায়ণের বিস্তারকে চিহ্নিত করে। উল্লেখ্য, ১৯৯১ সালে জেলার মাত্র ৭% ঘরে বিদ্যুৎ সংযোগ ছিল। এই জেলায় মোট ৪৭১ টি টেলিফোন সংযোগ রয়েছে।

শিল্প ও বাণিজ্য অবকাঠামো

এই জেলায় প্রধানত ক্ষুদ্র ও মাঝারি ধরনের শিল্প রয়েছে। এদের মধ্যে টেক্সটাইল মিল, বিস্কুট ফ্যাক্টরি, কলম তৈরির কারখানা, স-মিল, বরফ কল, ধান ও গম মাড়াইর কল, লেদ মেশিন ও ঝালাইর কারখানা ও প্রেস অন্যতম। এ ছাড়াও এই জেলায় ২০-২৫টি ইটের ভাঁটা আছে।

কুটির শিল্পের মধ্যে বাঁশ ও বেতের কাজ, মাদুর ও পাটি বোনা, স্বর্ণকার, কামার, কুমার, কাঠের কাজ, পিতল ও তামার কাজ, দর্জি প্রভৃতি অন্যতম।

কৃষি অবকাঠামো

কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধি অনেকাংশেই কৃষি অবকাঠামোর উপর নির্ভরশীল। নড়াইল জেলার মোট আবাদকৃত জমির মাত্র ৩০% জমিতে সেচ দেয়া হয়। এই হার উপকূল গড়ের সমান (৩০%) এবং বাংলাদেশ গড়ের (৫০%) চেয়ে অনেক কম। আবার প্রায় ৪% জমিতে ভূ-পৃষ্ঠের পানি থেকে সেচ দেয়া হয়। জেলায় মোট ৬,১৯৮টি অগভীর নলকূপ, ১টি শক্তিচালিত পাম্প এবং ৬৩৮টি এলএলপি আছে। কৃষি শুমারী থেকে দেখা যায় ৭০% গ্রামীণ পরিবার জমিতে রাসায়নিক সার ব্যবহার করে থাকে, ০.১২% পরিবার ট্রাক্টর ও ০.২২% পরিবার পাওয়ার টিলার ব্যবহার করে থাকে। ৬৬% বাড়িতে শস্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে। বি.বি.এস. (১৯৯৮) এর তথ্য অনুসারে এই জেলায় মোট ১৭টি গুদাম রয়েছে। যাদের মোট ধারণক্ষমতা হল ২৮,৯৪০ মে. টন। এখানে ১০ টি ডেইরি ফার্ম, ২১ টি পোলট্রি ও ৩ টি হ্যাচারী রয়েছে।

সেচ এলাকা (মোট)	২০,৭৮৭ হেক্টর
সেচ এলাকা (%)	৩০%
ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহার	২৬%
উপরিভাগের পানি ব্যবহার	৪%

গুদামের ধরন	সংখ্যা	ধারণ ক্ষমতা (মে. টন)
খাদ্য	১০	৮,৩৯০
বীজ	৩	৫৫০
সার	৪	২০,০০০

উন্নয়ন প্রকল্প

উপকূলীয় অঞ্চলের উন্নয়ন প্রকল্পের উপর পরিচালিত এক সমীক্ষা (পিডিও-আইসিজেডএমপি ২০০৪) থেকে দেখা যায়, ২০০৪-২০০৫ অর্থ-বছরে নড়াইল জেলায় ৯টি সরকারী প্রকল্প চালু আছে। এই প্রকল্পগুলো ৮টি সরকারী সংস্থা বাস্তবায়ন করছে। যেসব সরকারি সংস্থার মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে সেগুলো হচ্ছে পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, পশু সম্পদ অধিদপ্তর, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড ইত্যাদি।

সরকারী সংস্থা	প্রকল্প সংখ্যা
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা	১
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর	১
মৎস্য অধিদপ্তর	১
পশু সম্পদ অধিদপ্তর	১
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	২
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর	১
পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড	১
বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড	১

উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রকল্প হল - দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় পানি সম্পদের সমন্বিত ব্যবস্থাপনা প্রকল্প, বৃহত্তর যশোর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প, চতুর্থ মৎস্য প্রকল্প, সমাজভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্প, ১৬ শহর বিদ্যুৎ পরিচালন প্রকল্প, পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প, ১৮ পি.বি.এস. বিদ্যুৎ সঞ্চালন জোরদারকরণ ও সম্প্রসারণ প্রকল্প, গ্রামীণ রাস্তায় স্বল্প ব্যয়ে ব্রীজ / কালভার্ট নির্মান প্রকল্প, ১৮ জেলায় পানি বিতরণ পয়ঃ ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ব্যবস্থা নির্মান প্রকল্প, পল্লীর মহিলাদের জন্য জীবিকায়ণ প্রকল্প ইত্যাদি। জেলার উন্নয়নে এনজিওদের অবদানও অনস্বীকার্য। এই

জেলায় কর্মরত প্রধান এনজিওগুলোর মধ্যে কেয়ার, সিডিপি, ব্র্যাক, প্রশিকা, আশার আলো, চিত্রা মহিলা সমিতি, নিউ লাইফ ফাউণ্ডেশন অন্যতম।

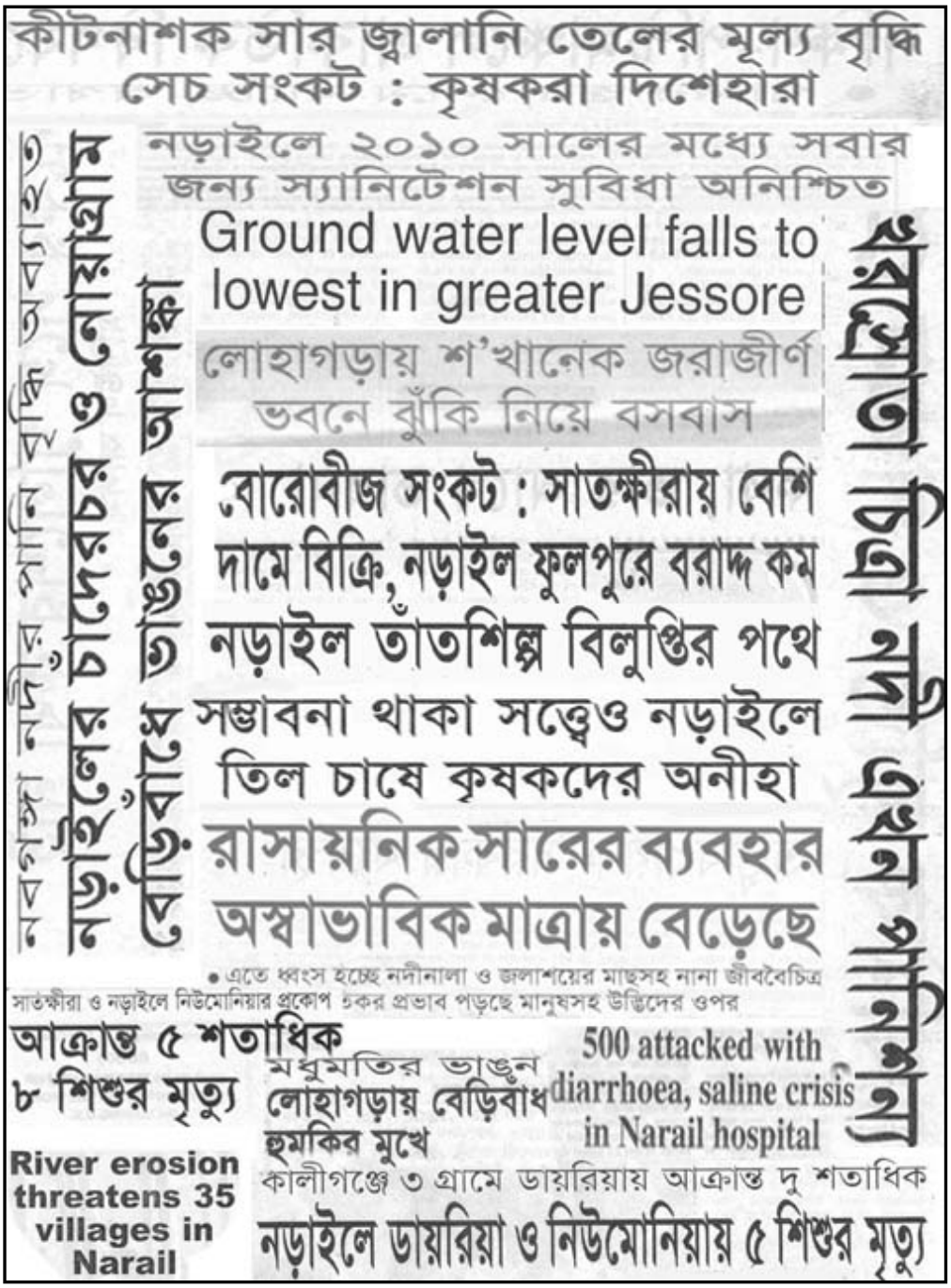

কীটনাশক সার জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি
সেচ সংকট : কৃষকরা দিশেহারা

নড়াইলে ২০১০ সালের মধ্যে সবার
জন্য স্যানিটেশন সুবিধা অনিশ্চিত

নবগঙ্গা নদীর পানি বৃদ্ধি অব্যাহত
নড়াইলের চাঁদেরচর ও লোয়াগ্রাম
বেড়িবাঁধে ভাঙনের আশঙ্কা

Ground water level falls to
lowest in greater Jessore

লোহাগড়ায় শ'খানেক জরাজীর্ণ
ভবনে ঝুঁকি নিয়ে বসবাস

খরস্রোতা চিত্রা নদী এখন পানিশূন্য

বোরোবীজ সংকট : সাতক্ষীরায় বেশি
দামে বিক্রি, নড়াইল ফুলপুরে বরাদ্দ কম

নড়াইল তাঁতশিল্প বিলুপ্তির পথে

সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও নড়াইলে
তিল চাষে কৃষকদের অনীহা

রাসায়নিক সারের ব্যবহার
অস্বাভাবিক মাত্রায় বেড়েছে
• এতে ধ্বংস হচ্ছে নদীনালা ও জলাশয়ের মাছসহ নানা জীববৈচিত্র
• ক্ষতিকর প্রভাব পড়ছে মানুষসহ উদ্ভিদের ওপর

সাতক্ষীরা ও নড়াইলে নিউমোনিয়ার প্রকোপ
আক্রান্ত ৫ শতাধিক
৮ শিশুর মৃত্যু

মধুমতির ভাঙন
লোহাগড়ায় বেড়িবাঁধ
হুমকির মুখে

500 attacked with
diarrhoea, saline crisis
in Narail hospital

River erosion
threatens 35
villages in
Narail

কালীগঞ্জে ৩ গ্রামে ডায়রিয়ায় আক্রান্ত দু শতাধিক

নড়াইলে ডায়রিয়া ও নিউমোনিয়ায় ৫ শিশুর মৃত্যু

সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা

নড়াইল জেলার মানুষ একদিকে যেমন বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার, অপরদিকে পারিপার্শ্বিকতার ফলে সৃষ্ট বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার দ্বারাও আক্রান্ত হয়। প্রাচীনকাল থেকেই এই জেলার মানুষ জলাবদ্ধতা, বন্যা ও নদী ভাঙ্গনের সাথে লড়াই করে আসছে। কিন্তু সব সমস্যা দ্বারা যেমন জেলার সব এলাকা আক্রান্ত হয় না তেমনি সব পেশার, সব শ্রেণীর মানুষও সমানভাবে আক্রান্ত হয় না। নীচে বিভিন্ন পর্যায়ের আলোচনায় চিহ্নিত প্রধান কিছু সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতার কথা আলোচনা করা হল।

পরিবেশগত সমস্যা

পরিবেশগত সমস্যা
- নদী ভাঙন
- নদী ভরাট
- নদীর পানি প্রবাহ হ্রাস
- বন্যা
- মাছের প্রজাতি হ্রাস
- আর্সেনিক
- মাটি ও পানির লবণাক্ততা
- জলাবদ্ধতা
- পানির স্তর নীচে নেমে যাওয়া
- কৃষি জমির উর্বরতা হ্রাস
- ইটের ভাঁটার দূষণ

আর্থ-সামাজিক সমস্যা
- অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা
- আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি
- তাঁত শিল্পের বিলুপ্তি
- মাছ চাষের সমস্যা

নদী ভাঙন : নদী ভাঙন জেলার মানুষের একটি বড় সমস্যা। মধুমতি, নবগঙ্গা নদীর ক্রমাগত ভাঙন, ঘরবাড়ি, বাগান, কৃষিজমি, সরকারি সম্পত্তি, অর্থনৈতিক কেন্দ্রগুলোর ক্রমাগত ক্ষতি সাধন করে চলছে। প্রতি বছরই অনেক মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়ছে, কৃষিজমি বিলীণ হয়ে যাচ্ছে ।

নদী ভরাট : জেলার প্রধান নদীগুলো পলি জমে নাব্যতা হারাচ্ছে। আগে যে সব জল পথ দিয়ে বড় বড় লঞ্চ ও স্টিমার চলতে পারতো এখন সেগুলো ভরাট হয়ে নৌ যোগাযোগে বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে।

নদীর পানি প্রবাহ হ্রাস : নদীতে মিঠা পানির প্রবাহ হ্রাসের ফলে নদী নালাগুলোতে লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ বাড়ছে। ফলে জেলার পরিবেশ ও প্রতিবেশ পাল্টে যাচ্ছে।

বন্যা : নদী ভাঙন, জলাবদ্ধতার সাথে সাথে বন্যাও এই জেলায় একটি বড় প্রাকৃতিক দুর্যোগ হিসেবে দেখা দেয়। জেলায় অনেক নিচু জমি ও বিল থাকার ফলে বন্যার পানি সরে যেতেও বিলম্ব হয়।

মাছের প্রজাতি হ্রাস : দীর্ঘদিন ধরে দেশী জাতের মাছ ধীরে ধীরে লোপ পেয়ে যাচ্ছে। জলাভূমি, পুকুর, দীঘি, খাল, নদী, বিল, বাওর থেকে দেশী জাতের মাছের পরিমাণ ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে। বছর কয়েক আগেও জেলার জলাভূমিগুলো বিভিন্ন জাতের দেশী মাছ যেমন ইলিশ, রুই, কাতলা, চিতল, বোয়াল, শোল, মাগুর, কই, শিং, পুটি, সরপুটি, টাকি, আইড়, বাইন, ভেদা, তেলাপিয়া, টেংরা, মলা, ঢেলা প্রভৃতি মাছে পরিপূর্ণ ছিল। ব্যাপক পলি পড়ে নদীগুলো শুকিয়ে যাওয়ায় নির্বিচারে মাছ ধরা, শামুক ধরা, অপরিকল্পিত মাছ চাষ, কৃষি জমিতে অত্যধিক রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহারের ফলে জলাভূমিগুলোর দূষণ প্রভৃতি কারণে মাছের পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে। কারেন্ট জাল ব্যবহার ও মাছের পোনা ধরার ফলেও মাছের পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে। অতিরিক্ত মাছ ধরার কারণে আগে যে পরিমাণ মাছ পাওয়া যেত এখন আর সেই পরিমাণ পাওয়া যায় না।

আর্সেনিক : আর্সেনিক আক্রান্ত জেলাগুলোর মধ্যে নড়াইল অন্যতম। জেলার নলকূপগুলোর মধ্যে ৪২ শতাংশেই আর্সেনিকের মাত্রা ৫০ মাইক্রোগ্রাম/লিটারের চেয়ে বেশি, যা স্বাস্থ্যগত দিক থেকে গ্রহণযোগ্য মাত্রার চেয়ে অনেক বেশি।

এত বেশিমাত্রার আর্সেনিক শুধু ত্বকের রোগই সৃষ্টি করে তাই নয়, বেশি দিনের সংক্রমণে এটি ক্যান্সার ও ফুসফুসের রোগ সৃষ্টি করে থাকে।

মাটি ও পানির লবণাক্ততা : পানির লবণাক্ততা একদিকে যেমন সুপেয় পানির প্রাপ্যতা কমিয়ে দেয় অপরদিকে বিভিন্ন ধরনের রোগেরও কারণও হয়ে থাকে। অপরদিকে মাটিতে লবণাক্ততার জন্য সব ধরনের ফসলও হয় না এবং মিঠা পানির অভাবে সব সময় সেচও দেয়া যায় না। এই জেলায় মাটি ও পানির লবণাক্ততার মাত্রা ধীরে ধীরে বাড়ছে।

জলাবদ্ধতা : জেলায় জলাবদ্ধতা একটি প্রধান সমস্যা। বর্ষাকালে পানি জমে থাকার কারণে জেলায় নিচু এলাকায় রোপা আমন ধানের সুযোগ থাকলেও তা করা যায় না।

পানির স্তর নীচে নেমে যাওয়া : পানির স্তর নীচে নেমে যাওয়ার ফলে নড়াইল জেলা পরিবেশগত বিপর্যয়ের মুখে পরেছে। এই অঞ্চলে বন নাই বললেই চলে। তার উপর বৃক্ষনিধন হচ্ছে অবাধে। ফারাক্কার প্রভাবে বেশিরভাগ নদীই শুকিয়ে গেছে অথবা মৃতপ্রায় হয়ে গেছে। অনাবৃষ্টির পরিমাণও বেড়েছে, বেড়েছে সেচের মাত্রা। আর মূলত এ কারণগুলোই পানির স্তর অস্বাভাবিকভাবে নেমে যাওয়ার পিছনে কাজ করছে। এ ছাড়াও এই জেলায় পুকুর, জলাভূমি ও নীচু জমি সমানে ভরাট করা হচ্ছে। ফলে বর্ষাকালে পানি ধরে রাখা যায় না। এ ছাড়া ইরি বোরো চাষ ও শিল্প কারখানার জন্য খরা মৌসুমে ব্যাপক পানি উত্তোলন করা হয়। কিন্তু অনাবৃষ্টির ফলে সে পরিমাণ পানি শোসন হয় না। যার দরুন পানির স্তর স্থায়ীভাবে নিচে নেমে যাচ্ছে। পানির স্তরের নিম্নমুখী গতি ঠেকানো না গেলে ভয়াবহ বিপর্যয় অবশম্ভাবী হয়ে পড়বে।

কৃষি জমির উর্বরতা হ্রাস : অপরিকল্পিত ও মাত্রাতিরিক্ত রাসায়নিক সার ব্যবহারের ফলে কৃষি জমিগুলো উর্বরতা হারাচ্ছে। একই ফসল বার বার চাষ করা ও অতিরিক্ত সেচ দেওয়ার ফলেও জমির উর্বরতা হারাচ্ছে। অতিরিক্ত সেচের ফলে জমিতে বেশি সময় ধরে পানি থাকে। ফলে মাটিতে অক্সিজেনের পরিমাণ হ্রাস পায়। এ ছাড়া জিঙ্ক ও সালফারের পরিমাণও হ্রাস পায়। অনেক কৃষক ইউরিয়া, টি.এস.পি ও পটাশ সার নির্বিচারে ব্যবহার করে। তারা এমনকি সারের পারস্পরিক অনুপাতও বজায় রাখে না। ফলে মাটি শক্ত হয়ে যাচ্ছে এবং গাছের শিকড় প্রবেশ করতে পারে না। একই ফসল বছরের পর বছর চাষ করার ফলে মাটির একটি নির্দিষ্ট স্তরের পুষ্টি উপাদানগুলো ধীরে ধীরে শেষ হয়ে যাচ্ছে।

ইটের ভাঁটা দুষণ : নড়াইল জেলায় বেশ কয়েকটি ইটের ভাঁটা আছে। এ সব ভাঁটাতে জ্বালানি হিসেবে কয়লা ও স্থানীয়ভাবে সংগৃহিত গাছ ব্যবহার করা হয়। ভাঁটা থেকে নির্গত ধোয়ায় বায়ু দুষণ হচ্ছে। আবার কয়লা মাটিতে স্তুপ করে রাখার ফলে মাটি দুষণও হচ্ছে।

আর্থ-সামাজিক সমস্যা

অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা : শুকনো মৌসুম আসলেই জেলার লোহাগড়া উপজেলার উপর দিয়ে প্রবাহিত এক কালের প্রমত্তা মধুমতি ও নবগঙ্গা নদীতে পলি জমে অসংখ্য ছোট বড় চর জেগে ওঠে। ফলে বড়দিয়া নৌ-বন্দরসহ নদী তীরবর্তী সকল ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও হাট-বাজারে নৌপথে পণ্য পরিবহনে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। এমনকি মধুমতি ও নবগঙ্গা নদী দুটির তলদেশ ভরাট হয়ে বিভিন্ন স্থানে চর জেগে ওঠায় চর দখল করে নদী তীরবর্তী মানুষেরা ধান চাষ করছে।

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি : আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নড়াইল জেলার জন্য একটি বড় সমস্যা। চিংড়ি ঘেরগুলোতে বিবাদ, বিল এলাকাতে মাছ ধরা নিয়ে বিবাদ, সর্বহারাদের উপদ্রব, চর নিয়ে বিরোধ প্রভৃতি কারণে মাঝে মধ্যেই জেলার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির বিশেষ অবনতি হয়।

তাঁত শিল্পের বিলুপ্তি : প্রয়োজনীয় পুঁজির অভাবে ও অব্যাহত সুতার মূল্য বৃদ্ধির কারণে নড়াইলে তাঁত শিল্প বিলুপ্তির পথে। তাঁত শিল্পে নেই জৌলুস, নেই মুনাফা। ধারের জ্বালা মেটাতে তাঁতিপাড়ার দক্ষ কারিগড়রা চৌদ্দ পুরুষের পেশা পরিবর্তন করেছে। বেছে নিয়েছে দিন মজুর, রিক্সা, ভ্যান চালানোর কাজ। নড়াইল শহর থেকে চার কিলোমিটার দক্ষিণে গোবরা গ্রামে তাঁতিপাড়ার অবস্থান। এক সময় বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে দিন রাত চলতো তাঁতবস্ত্র তৈরির কাজ। কেউ সুতা বুনত, কেউবা সুতার রং করত আবার কারো কাজ ছিল কাপড় বোনার। বোনা হত গামছা, লুঙ্গি, মশারি ইত্যাদি। স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে পার্শ্ববর্তী যশোর, খুলনা, মাগুরা ও গোপলগঞ্জ জেলায় পাঠানো হতো এসব। গুনগতমান ভালো হওয়ায় দূর-দূরান্তের ক্রেতারা নড়াইলের গামছা বা লুঙ্গি পেলেই নিশ্চিন্তে লুফে নিতেন। কালের আবর্তে এ সবই এখন ইতিহাস। তাঁতিপাড়ায় এখন প্রায় তিন'শ পরিবার বাস করছে। সব পরিবারে তাঁত মেশিন ও প্রয়োজনীয় আনুষঙ্গিক সরঞ্জাম থাকলেও এখন মাত্র বিশটি পরিবার তাঁতের কাজ করে।

মাছ চাষের সমস্যা : যদিও জেলার জলাভূমি ও পুকুর থেকে মাছ উৎপাদনের হার অত্যন্ত বেশি কিন্তু বিভিন্ন কারণে এই হার ক্রমশ কমে আসছে। কারণগুলোর মধ্যে বিল, খাল, নদী ভরাট; কারেন্ট জাল দিয়ে মাছ ধরা; অতিরিক্ত মাছ আহরন; সেচ ও অন্যান্য কাজের জন্য পানি উত্তোলন; জলাভূমি শুকিয়ে অন্য কাজে ব্যবহার; কৃষি জমির সম্প্রসারণ ইত্যাদি অন্যতম। ফলে জেলে এবং মাছ চাষের উপর নির্ভরশীল পেশাজীবিদের অবস্থা দিন দিন খারাপ হচ্ছে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সার্কুলার
কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প চার বছরের জন্য আয়করমুক্ত
ADB-financed road to open next year
Dhaka-Khulna distance to be cut by 100 kilometres
বিষ নয়, ফাঁদে আটকে ক্ষতিকর কীট দমন
Shrimp export could see five-fold rise by 2008
Promote indigenous vehicles
Nasimon and Karimon are favourite to rural people but opposed by police
Traders urge govt to help promote flower export
নড়াইল ও মুক্তাগাছায় বেসরকারী উদ্যোগে সংযবদ্ধ দুগ্ধ ও প্রতিবন্ধীরা স্বাবলম্বী হচ্ছে
দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে অর্থকরী বিকল্প ফসল হিসেবে মেলে চাষ হচ্ছে

সম্ভাবনা ও সুযোগ

নড়াইল জেলার মানুষের সামগ্রিক জীবনমানের উন্নয়নের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। সম্পদ ও সুযোগের উপযুক্ত ব্যবহার করে জেলার প্রভূত উন্নয়ন সাধন সম্ভব। বিভিন্ন পর্যায়ের আলোচনায় চিহ্নিত কয়েকটি প্রধান সম্ভাবনার কথা নিচে আলোচনা করা হল।

কৃষি সম্পদ উন্নয়ন

কৃষি উন্নয়ন : বাংলাদেশ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর জেলায় কৃষি সম্প্রসারণের জন্য ব্যাপক পদক্ষেপ নিয়েছে। এই বছর (২০০৪/২০০৫) জেলায় মোট নয় হাজার হেক্টর জমিতে পাট চাষের লক্ষ্যমাত্রা ধারণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে পাট চাষীদের মধ্যে বীজ, সার কীটনাশক এবং কৃষিঋণ বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া নড়াইলের তিনটি উপজেলায়ই রোপা আমন চাষের ব্যাপক পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। ১৭,২০০ হেক্টর জমি রোপা আমন চাষ করে ৪৫,১৪০ মেট্রিক টন ধান উৎপাদনের পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে। এই জেলা শীতকালীন শাক-সবজি, যেমন সীম, বেগুন, পালংশাক, লালশাক, কুমড়া, ঢেড়শ, ধনিয়া, বরবটি চাষের উপযোগী। উপযুক্ত আবহাওয়ায় উচ্চ ফলনশীল বীজ ও উন্নত চাষাবাদ পদ্ধতি ব্যবহার করা হলে সবজি উৎপাদন অনেক বাড়ানো সম্ভব।

কৃষি সম্পদ উন্নয়ন
- কৃষি উন্নয়ন
- মাছ চাষ
- নার্সারী শিল্প
- চিংড়ি চাষ
- লবণ শিল্পের উন্নয়ন
- পোল্ট্রি ফার্মিং
- হাঁস-মুরগী ও গবাদি পশু পালন

শিল্প উন্নয়ন
- ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসার
- শিল্পাঞ্চল

আর্থ-সামাজিক এবং অবকাঠামোগত উন্নয়ন
- আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন
- টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি

বিপুল সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও জেলার তিনটি উপজেলায় তিল চাষ হচ্ছে না। প্রতিকূল আবহাওয়া, কৃষি উপকরণের মূল্য বৃদ্ধি, সার সংকটসহ উৎপাদিত তিলের ন্যায্য মূল্য না পাওয়ায় কৃষি নির্ভর এই জেলার কৃষকরা তিল চাষে আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে। অপেক্ষাকৃত নীচু জমিতে তিল চাষ করলে ফলন ভালো হয়। জেলায় এ রকম জমির পরিমাণ প্রায় দুই হাজার হেক্টর। কিন্তু চলতি বছরে মাত্র অর্ধেক জমিতে তিল চাষ করা হয়েছে। কৃষকদের সচেতনতা সৃষ্টি করে তিল চাষের সম্ভাবনা বাড়ানো সম্ভব ।

নড়াইল জেলায় বেশকিছু এলাকায় বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ফুল চাষ করা হচ্ছে। তবে আরো বাড়ানো সম্ভব।

মাছ চাষ : নড়াইল জেলার প্রায় ৮৭% পুকুরে মাছ চাষ করা হয়ে থাকে এবং হেক্টর প্রতি মাছের উৎপাদন বছরে ২ মেট্রিক টন। আবার পরিত্যক্ত ও চাষযোগ্য পুকুরের পরিমাণ ১৩%, যেখানে মাছের গড় উৎপাদন বছরে ০.৭৮ মে.টন/হে.। এর হার উপকূলীয় ও বাংলাদেশ গড়ের চেয়ে কম। যদি জেলার সমস্ত পুকুরগুলোকে উন্নত মাছ চাষ পদ্ধতির আওতায় আনা হয় তবে উৎপাদন অনেক বাড়তে পারে। জেলার জলাভূমিগুলোতে সমাজভিত্তিক মাছ চাষের সম্ভাবনা আছে।

নড়াইল জেলায় বর্তমানে প্রায় ২৫০ হেক্টর জমিতে চিংড়ি চাষ করা হয়। যদিও এই হার অনেক কম, কিন্তু অনুকূল প্রাকৃতিক পরিবেশ ও লোকজনের উৎসাহের কারণে আশা করা যাচ্ছে যে এই হার আরো বাড়বে এবং জেলার অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

জেলার বিলগুলোতে মাছের উৎপাদন বাড়ানোর যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। ইতিমধ্যে অংশীদারিত্বমূলক মাছ সংরক্ষণ ও ধরার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

নার্সারী শিল্প : জেলায় ব্যক্তিখাতে নার্সারীর ব্যবসা বর্তমানে বেশ সাড়া জাগিয়েছে। এই লাভজনক ব্যবসার সাথে অনেক উৎসাহী লোক জড়িয়ে পড়ছে। জেলায় এ পর্যন্ত প্রায় ৫০০ নার্সারী স্থাপন করা হয়েছে এবং প্রায় দুই হাজার দক্ষ অদক্ষ শ্রমিক জড়িত রয়েছে। নার্সারীগুলোতে বিভিন্ন জাতের গাছ যেমন আম, কাঁঠাল, সেগুন, মেহগনি, শাল, লেবু, বাতাবী লেবু, লিচু, জাম ও বিভিন্ন ঔষধি গাছের চারা উৎপাদন করা হয়। নার্সারী মালিকদের যদি প্রাতিষ্ঠানিক ও অর্থনৈতিক সহায়তা দেয়া হয় তবে এই শিল্পের আরো প্রসার হবে।

চিংড়ি চাষ : নড়াইল জেলার ঈষৎ লবণাক্ত মাটি ও পানি গলদা ও বাগদা চিংড়ি চাষের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে থাকে। যদি উন্নত ও পরিবেশ বান্ধব নিবিড় পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষ করা হয় তবে তা মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সহায়তা করবে।

সম্প্রতি অ্যাগ্রো বেইসড ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যান্ড টেকনোলজি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট বা সংক্ষেপে এ.টি.ডি.পি-২ এ এস.এস.কিউ কার্যক্রমের অধীনে গ্রামীণ ফোনের সহযোগিতায় দেশের ৬০ হাজারের বেশি চিংড়ি চাষীদের জন্য তথ্য পরিসেবা চালু করেছে। চাষীরা গ্রামীণ ফোনের একটি নির্দিষ্ট নাম্বারে ফোন করে চিংড়ির স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজার দর, নতুন নতুন প্রযুক্তিতে চিংড়ি চাষের নানা খবরাখবর জেনে নেয়া যাবে।

পোল্ট্রি ফার্মিং : পোল্ট্রি ফার্মিং জেলায় বেশ জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। তিনটি উপজেলায় ২৫০টি বড় ও মাঝারি পোল্ট্রি ফার্ম ইতিমধ্যেই ব্যক্তি উদ্যোগে স্থাপন করা হয়েছে। ছাত্র, বেকার শিক্ষিত যুবক ও পেশাজীবীরা অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার আশায় পোল্ট্রি ব্যবসার সাথে জড়িয়ে পড়ছে। দেশের প্রধান শহরগুলোর সাথে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য ডিম ও মুরগী সহজেই বিভিন্ন স্থানে পাঠানো যাচ্ছে। আবার দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে পাইকাররা আসে। তবে এখন পর্যন্ত পোল্ট্রি শিল্পে সরকারি পর্যায়ে তেমন কোন সহায়তা দেয়া হয় না। যদি পর্যাপ্ত ঋণ ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা দেয়া হয় তবে এই শিল্পের আরো প্রসার হবে।

হাঁস-মুরগী ও গবাদি পশু পালন : নড়াইল জেলায় প্রচুর পরিমাণ পুকুর আছে যেখানে হাস পালন সম্ভব। উন্নতমানের প্রাণী খাদ্য, ওষুধ, চিকিৎসা এবং পণ্য বাজারজাতকরণের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা হলে এই জেলায় গবাদিপশু পালনের উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে।

শিল্প উন্নয়ন

ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসার : এই জেলায় কৃষিভিত্তিক ক্ষুদ্র শিল্পের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। জেলার প্রধান অর্থকরী ফসল যেমন পাট, তৈলবীজ, নারিকেল, সুপারী, ছন, বাশ, বেঁত ভিত্তিক কুটির শিল্প স্থাপন করা যেতে পারে। জনগণকে প্রয়োজনীয় আর্থিক ও কারিগরী সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা করা হলে এই শিল্পের প্রসারের সম্ভাবনা আছে।

শিল্পাঞ্চল : ৩টি উপজেলায় ৩টি শিল্পাঞ্চল গড়ে তোলা হলে একদিকে যেমন কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে এবং অন্যদিকে উৎপাদন বাড়বে। এই সকল শিল্পাঞ্চলে স্ব স্ব উপজেলার প্রবাসীরা বিনিয়োগ করবেন। সরকার সব ধরনের অবকাঠামো এবং আইনগত সহযোগিতা নিশ্চিত করবেন। ব্যক্তিখাতও সার্বিক সহযোগিতা দেবেন।

আর্থ-সামাজিক এবং অবকাঠামোগত উন্নয়ন

আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন : সমাজের দুস্থ অসহায় ও প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ ও ঋণ প্রদানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করে তুলতে কাজ করছে নানা বেসরকারি সংস্থা। কোন কোন এলাকায় সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রচেষ্টাও লক্ষণীয়। এসব সংগঠনের নেয়া কার্যকর পদক্ষেপের ফলে অনেক অসহায়ের মুখে আজ হাসি ফুটে উঠেছে। শুধু ঋণ প্রদানই নয়, বেসরকারি সংগঠনগুলো উন্নত বীজ, মাছ চাষ, ধানক্ষেতে মাছের চাষ, কৃষকদের উন্নত প্রযুক্তি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান ও তদারকি করছে। নড়াইলে গরীব মহিলারা নিজেরাই সংগঠিত হয়ে স্বাবলম্বী হওয়ার স্বপ্ন দেখছে। দুস্থ, অসহায় ও ভূমিহীন গরীব মহিলাদের নিয়ে গঠিত সংগঠন বাংলাদেশ উন্নয়নের লড়াই (বাউল) তাদের আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হওয়ার পথ দেখিয়েছে। নিজেদের হাতে তৈরি পণ্যসামগ্রী তাদের সংগঠন বাউল - এর মাধ্যমে বিক্রি করে অনেকেই আর্থিক দৈন্য ঘুচিয়েছে। দুস্থ, অসহায়, ভূমিহীন গরীব মহিলাকে বিভিন্ন সময়ে হস্তশিল্প ও সেলাই প্রশিক্ষণ প্রদান করে এবং সংগঠিত করে তোলে। পরবর্তী সময়ে এ সকল মহিলার তৈরি বিভিন্ন পণ্য যেমন শাড়ি, থ্রি-পিচ, নকশী কাঁথা, ব্যাগ, কুসন, কভার, ওয়ালম্যাট, চাঁদর দেশ-বিদেশে বিক্রি করা হয় এবং সম্ভাবনা দিনে দিনে আরো বাড়বে।

টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি : বাংলাদেশ টেলিফোন রেগুলেটরি কমিশন বেসরকারি উদ্যোগে টেলিফোন সংযোগ দেয়ার জন্য লাইসেন্স প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সমস্ত দেশকে কয়েকটি জোনে ভাগ করা হয়েছে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে নড়াইল জেলায় টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সম্ভব হবে।

ভবিষ্যতের রূপরেখা

	২০০১	২০১৫	২০৫০
মোট লোক সংখ্যা (লাখ)	৬.৯৫	৭.৫৬	৯.৫৩
পুরুষ	৩.৫১	৩.৮৭	৪.৭৭
নারী	৩.৪৪	৩.৬৯	৪.৭৭
লিঙ্গ অনুপাত	১০০:১০২	১০০:১০৫	১০০:১০০
শহুরে জনসংখ্যা (%)	১০	৯	১২

নড়াইল জেলায় বর্তমান জনসংখ্যা ৬.৯৫ লাখ (২০০১)। ধারণা করা হচ্ছে এই লোকসংখ্যা বেড়ে আগামী ২০৫০ সাল নাগাদ হবে ৯.৫৩ লাখ। ২০১৫ সাল বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল বাস্তবায়নের শেষ বছর। এই সময় নাগাদ লোকসংখ্যা হবে ৭.৫৬ লাখ। এই বিপুল জনগোষ্ঠীর মৌলিক চাহিদা (খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষা) পূরনের জন্য এখন থেকেই প্রস্তুতি চলছে। মানুষের আয় ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে। অবকাঠামো ও সরকারি পরিসেবার আরো অগ্রগতি হবে।

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অধীনে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সাথে ঢাকার যোগাযোগ উন্নয়নের জন্য দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় মহা সড়ক নির্মাণের কাজ চলছে। এই মহাসড়ক নির্মাণ শেষ হলে এবং মাওয়ায় পদ্মা সেতু নির্মিত হলে নড়াইল থেকে রাজধানীতে যাতায়াতের সময় অনেক কমে যাবে। তখন নড়াইল জেলার শিক্ষিত জনগোষ্ঠীকে কাজে লাগানোর জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ যেমন- গার্মেন্টস শিল্প, চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা স্থাপন কাজ হাতে নেয়া হতে পারে।

নড়াইল জেলায় কৃষি ও মৎস্য ভিত্তিক মাঝারি শিল্প স্থাপন করা যেতে পারে।

তবে জলবায়ুর পরিবর্তন, নদী প্রবাহ হ্রাস, লবনাক্ততা বৃদ্ধি, নদী প্রবাহের দিক পরিবর্তন, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি প্রভৃতির ফলে নড়াইল জেলার বিপুল এলাকা হুমকির সম্মুখীন।

দর্শনীয় স্থান

নড়াইল জেলার একটি সমৃদ্ধ রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস রয়েছে। নড়াইল জেলা অনেক ঐতিহাসিক ঘটনার স্বাক্ষী। এই জেলার মানুষ ১৮৫৯-৬০ সালের নীল বিদ্রোহ, ১৯৪৬ সালের তেভাগা আন্দোলনে অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। এ ছাড়া মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত অনেক স্থান রয়েছে। যদি এই সব স্থানগুলোকে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয় তবে তা প্রাচীণ ঐতিহ্য সংরক্ষণের পাশাপাশি পর্যটকদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

নড়াইল পৌর এলাকার মাছিমদিয়ায় আর্ন্তজাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিল্পী এস.এম সুলতানের চারু ও কারুকলা ইনস্টিটিউট। বিশ্ববরেণ্য শিল্প এস.এম. সুলতানের জন্মদিন (১০ই আগষ্ট, ১৯২৩ সাল) উপলক্ষে জেলায় সুলতান মেলা আয়োজন করা হয়। এই মেলা উপলক্ষে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এই সময় প্রচুর লোক সমাগম ঘটে এবং একটি দর্শনীয় স্থানে পরিণত হয়।

নড়াইল জেলায় বেশকিছু ঐতিহ্যমণ্ডিত মসজিদ ও মন্দির আছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল - গোয়াল বাথান গ্রামের ১৬৫৪ সালে নির্মিত মসজিদ, নলদিতে গাজীর দরগা, কদমতলা মসজিদ, উজিরপুরে রাজা কেশব রায়ের বাড়ি, জোড়বাংলায় আঠারশ শতকে নির্মিত রাধা গোবিন্দ মন্দির, লক্ষ্মীপাশায় কালিবাড়ি ও নিহিনাথ তলায় বরদিয়ার মঠ। এদের কয়েকটির বর্ণনা নিচে দেয়া হল।

নয়াবাড়ির পাতাল ভেদী রাজ প্রাসাদ : নড়াইল শহরের সাত মাইল উত্তরে নবগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত নয়াবাড়ী গ্রাম। এখানে রাজ প্রাসাদের ধবংসাবশেষ লক্ষ্য করা যায়। প্রায় ২৭০ গজ দীর্ঘ ও ২৫০ গজ প্রশস্ত উঁচু স্থানটির চারদিকে একটি পরিখার নীচুখাত লক্ষ্য করা যায়। রাজাবাড়ীর নীচ থেকে নবগঙ্গা নদীর ঘাট পর্যন্ত একটি সুড়ঙ্গপথ তৈরি করা হয়েছিল। চুন সুড়কির গাথুনি বিশিষ্ট সেকেলে পাতলা ইটের খিলান দ্বারা এই সুড়ঙ্গ পথ নির্মিত।

শেখহাটি/জগন্নাথপুর : ভৈরব নদের তীরে প্রাচীন গ্রাম শেখহাটি। ভৈরব ছিল প্রমত্ত। পাশেই বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে গড়ে উঠেছিল জন অধ্যুষিত নগরী, যাকে ঐতিহাসিক মীনহাজউদ্দীনের "তবক্ত-ই-নাসিরীতে" বলা হয়েছে শংখনট। শংখনটেরই অপভ্রংশ শেখহাটি। এই প্রাচীন নগরীর বহু নিদর্শন ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এখানে ছিল সেন রাজাদের বাগড়ি প্রদেশের রাজধানী। বৃদ্ধ রাজা লক্ষণ সেন ভৈরব নদী পথে নৌকায় উপস্থিত হন এবং শেষ জীবনে এখানেই ছিলেন। শেখহাটি, তপনভোগ, পচিশা, জগন্নাথপুরে প্রায় ৮/১০ মাইল এলাকায় আছে উঁচু ভূমি। মাঝে মাঝে বিরাটকায় জলাশায়ের খাত। উঁচু ভূমি খুড়ে পাওয়া যায় ইটের স্তূপ, যা সুরকি আর চুনে ভরা। শেখহাটি গ্রামের বিজয়তলায় জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে আছে ভুবনেশ্বরী মন্দির। মন্দিরটি কত বছর আগে তৈরি জানা নেই। মন্দিরের মূল্যবান ভুবনেশ্বরী বিগ্রহ বর্তমানে রাজশাহীর বরেন্দ্র সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত। শেখহাটির আফরা গ্রামে ভৈরব ও চিত্রাসঙ্গমে প্রতি বছর পৌষ সংক্রান্তীর পুণ্যস্নান ও মেলা আজও সজীব হয়ে ওঠে অসংখ্য হিন্দু পুণ্যার্থীদের আগমনে। দূর-দূরান্ত থেকে আসে বহু মানুষ। বলা হয়ে থাকে এই মেলার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন সেন রাজারা।

নলদী গাজির দরগাহ : সব ধর্মের মানুষের শ্রদ্ধায় আজও নলদীগাজীর বাড়ি প্রাণবন্ত। নলদী বাজারের পশ্চিমে একটি ঈদগাহ, একটি গোরস্থান এবং একটি দরগাহর ধবংসাবশেষ রয়েছে। জনশ্রুতি আছে খান জাহান আলীর সঙ্গীদের একজন কাজি উপাধিযুক্ত ব্যক্তি এখানে বসতি করেছিলেন।

গোয়াল বাথানের মসজিদ : প্রায় তিনশ' বছর আগে নড়াইল থানার গোয়াল বাথান গ্রামে একটি সুন্দর মসজিদ করেছিলেন মুনসি হয়বাতউল্লাহ এবং তার ভাই মুনসি একরাম উল্লাহ। জেলার অন্যতম প্রত্ন সম্পদ হিসেবে বিবেচিত মসজিদটি ১৮৬৪ সালের ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং পরে সংস্কার করা হয়।

কালিয়া : নড়াইল জেলার অন্যতম থানা এবং সমৃদ্ধ জনপদ, নদীবন্দর ও বাণিজ্যকেন্দ্র। এখানে উদয়শংকর, রবিশংকরের আদি বসত বাড়ি।

মাউলি : এই গ্রামটি প্রাচীন ও সমৃদ্ধ। এখানে একটি জমিদার বাড়ির ধ্বংসাবশেষ রয়েছে।

কদমতলার প্রাচীন মসজিদ : চিত্রানদীর উত্তর তীরে কদমতলায় প্রায় আড়াইশ' বছর আগে একজন সুফী কুরেল শাহ দেওয়ান আস্তানা নির্মাণ করে বাস করতেন। আস্তানার কাছেই একটি মসজিদ ও কুরেল শাহের মাজার আছে।

সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা

প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট অফিস সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (পিডিও-আইসিজেডএমপি) পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো)-র একটি প্রকল্প। এটি একটি বহুখাতভিত্তিক এবং বহুপ্রতিষ্ঠানভিত্তিক উদ্যোগ। একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় স্টিয়ারিং কমিটি এবং একটি টেকনিক্যাল কমিটির নির্দেশনায় এটি পরিচালিত হয়। আনুষ্ঠানিকভাবে এর কার্যক্রম শুরু হয়েছে ফেব্রুয়ারি, ২০০২ সালে।

উপকূলীয় উন্নয়নের সার্বিক লক্ষ্য হচ্ছে এমন একটি পরিবেশ তৈরি করা যেখানে টেকসই জীবিকা উন্নয়ন এবং জাতীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সাথে উপকূলীয় এলাকার উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সমন্বয় সাধন করা যায়।

এই প্রকল্পের কর্মকাণ্ডকে ছয়টি কর্মসূচিতে ভাগ করা হয়েছে -

- উপকূল অঞ্চল নীতি প্রণয়ন
- উপকূল অঞ্চলের জন্য কর্মকৌশল প্রণয়ন
- উপকূল অঞ্চলের উন্নয়নে বিনিয়োগ পরিকল্পনা প্রণয়ন
- উপকূল অঞ্চলের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন
- প্রতিষ্ঠান ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা
- একটি সমন্বিত জ্ঞান ভাণ্ডার

বর্তমানে প্রকল্প থেকে বহু বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদনসহ উপকূল অঞ্চল নীতি প্রণীত হয়েছে। উপকূল অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নের রূপরেখা প্রণয়নে উপকূলীয় এলাকার গণমানুষের পরামর্শ ও মতামত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর তাই প্রকল্প শুরুর সময় থেকে আজ অবধি সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা ও জেলাবাসীর অংশগ্রহণে অনেকগুলো বৈঠক, গবেষণা ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এরই ধারাক্রমিক বিবরণ নীচে তুলে ধরা হল।

উপকূলীয় জেলার বিপদাপন্নতার কারণ অধ্যয়ন	**জুন, ২০০৩।**
খসড়া উপকূল অঞ্চল নীতির উপর জেলা পর্যায়ে মতবিনিময় সভা	**সেপ্টেম্বর, ২০০৩।**

জনসাধারণের সার্বিক অবস্থা জানার লক্ষ্যে পারস্পরিক আন্তঃক্রিয়ার বিষয়টি এখানেই থেমে নেই। প্রকল্পের পরিকল্পনা অনুযায়ী এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া হিসেবে চলতে থাকবে। খুব শিগগিরই প্রকল্প ও জেলাবাসীর অংশগ্রহণে অংশীদারদের আলোচনা, উপকূলীয় উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণ ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হবে।